নদীর এপার কহে

জরাসন্ধ

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ১এ নবীন কুণ্ডু লেন । কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস
২এ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৬২

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

সিলস্ক্রীন ঃ এস, বি, স্ক্রীন
১১ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ
রাখালচন্দ্র প্রামাণিক
দি নিউ তারকেশ্বর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯/৬ নরসিং লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

লৌহ কপাট
জায়গা আছে
দেহ শিল্পী
পরশমণি
সপ্তবহ্নি
ন্যায়দণ্ড
মসিরেখা
ছায়াতীর
ভুস্ত্যান
পসারিণী
নমিতা
অপর্ণা
আশ্রয়
পাড়ি
বন্যা
মল্লিকা

র
দখা
তটি
য়েক
ক্ষ্য

দূরপাল্লার গাড়ি; কামরাটা বেশ বড়।' ওরা বসেছিল ওধারের শেষ বেঞ্চিতে, একটা ধার ঘেঁষে। মহিলাটি ছিল জানালার পাশে। এত দূর থেকে পুরোটা দেখা যাচ্ছিল না। তবু অরুণার মনে হল, 'সে'-ই হবে। তার মত অন্য কেউও হ'তে পারে। অনেকটা একরকম দেখতে কত লোকই তো আছে। তাছাড়া সে এখানে আসবে কেমন করে? সাজ-পোশাক দেখে তো মনে হয় না দূরে কোথাও যাচ্ছে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে চোখ দুটোকে সরিয়ে নিল। কিন্তু তারা শুনল না। বারবার গিয়ে পড়ছিল ঐ জানালার ধারটিতে। কৌতূহলটা থামতে চাইছিল না।

জানালার ধারের মহিলাটি কিন্তু একবারও এদিকে দেখছিল না। পাশের দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে হাসি-গল্পে মেতে ছিল। অরুণার সঙ্গে চোখাচোখি হলে বোঝা যেত 'সে' কিনা। হলে ওকে নিশ্চয়ই চিনে ফেলত। কিন্তু সে রকম কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। অরুণা যে একবার উঠে গিয়ে কাছ থেকে দেখবার চেষ্টা করবে তাতেও মুশকিল। তার তিনটি শ্রীমান মিলে যা কাণ্ড করছে। তিনটি বলা ঠিক হল না। বড়টি বড় হয়েছে; তাছাড়া এমনিতেও বেশ শান্ত, নিজের মনে থাকে, লাফালাফি হৈ চৈ এর মধ্যে নেই। কিন্তু পরের দুটি রীতিমত বিচ্ছু। দু-মিনিট অন্তর জায়গা বদলাচ্ছে, কখনও জানালায় গিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে, কখনও দরজার হাতল ধরে টানাটানি করছে, তারপরেই অকারণে ঢুকে পড়ছে বাথরুমে। ওদের সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছে অরুণা। এতক্ষণে এগিয়ে হঠাৎ-দেখা সম্ভাবিত বাল্য-বন্ধুর খোঁজ নেবে, সে ফুরসৎ কোথায়?

গাড়ি ব্যাণ্ডেলে পৌঁছল। কুলি ডেকে সচল ও অচল মিলে ছ-সাতটি মোটঘাট সামলে নামাটাই এক বিষম ব্যাপার। মিনিট কয়েক অন্যদিকে তাকাবার অবসর হল না। যখন হল, সবিস্ময়ে লক্ষ্য

করল অরুণা, ওরা তিনজনও নেমে পড়েছে এবং উল্টোদিকে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। পিছনটা দেখে এবং চলার ভঙ্গি লক্ষ্য করে অনেকখানি নিঃসন্দেহ হল। কিন্তু এসব রেখে যায় কেমন করে? তাই বলে এতকাল পরে এত কাছে এসেও দেখা হবে না! এত ভাব ছিল দুজনের! বড় ছেলেকে ডেকে বলল, কানু, একটা কাজ করতে পারবি?

কি মা?

ওই যে মেয়েটি যাচ্ছে না, দৌড়ে গিয়ে ওকে বলবি, আপনার নাম কি সুলেখা? আমার মা জানতে চাইছে।

কানু চোখ নামিয়ে বলল, আমি পারব না; আমার লজ্জা করে।

লজ্জা করে! ঝাঁজিয়ে উঠল অরুণা, ব্যাটাছেলে হয়েছিস কি করতে! যেমন মেনীমুখো বাপ, তেমনি হয়েছে ছেলে।

তার ও তার বাবার পৌরুষের উপর এই যুগপৎ আক্রমণ, কানুর বয়সী ছেলের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। সে সেকেণ্ডখানেক গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চলতে শুরু করল। মা পিছন থেকে তাড়া দিল, তাড়াতাড়ি যা।

প্রশ্ন শুনে মহিলাটি অবাক—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার নাম সুলেখা। কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

মা জানতে পাঠিয়েছে।

মা! কে তোমার মা? কোথায়?

হাত তুলে দেখিয়ে দিতেই প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল সুলেখা। কয়েক সেকেণ্ড লাগল বোধহয় চিনতে। তারপরেই জড়িয়ে ধরে বলল, তুই! কী আশ্চর্য! এখানে কি করছিস? কোথায় যাবি?

যাব না; এলাম।

এই গাড়িতে?

তোর সঙ্গে একই কামরায়।

তাই নাকি? কই দেখতে পাইনি তো।

আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু এত দূরে বসেছিলাম—

ও হ্যাঁ ; একেবারে ওধারটায় একজন মহিলা বসে ছিল বটে। গিন্নি-বান্নীর মত দেখতে। কেমন করে জানব, তুই !

মত কেন, সত্যিই তো গিন্নীবান্নী। ছেলে দশ বছরে পড়ল। অ্যাদ্দিন তবু শাশুড়ী ছিলেন মাথার ওপর। গেল বছর চলে গেলেন। তোর খবর কী ? কোথায় যাচ্ছিস দল বেঁধে ? বলে, সিঁথির দিকে চোখ তুলল অরুণা।

সুলেখা লক্ষ্য করে বলল, ওখানে কী দেখছিস ? এখনও কেউ জোটেনি কপালে। তার মানে জোটাতে চাসনি। সঙ্গে ওরা কে ? কলিগ্ ; এক অফিসে কাজ করি। তোর কথা বল। কোত্থেকে এলি ? কত্তাকে তো দেখছি না।

তার সময় কোথায় ? একগাদা পরীক্ষার খাতা নিয়ে ব্যস্ত। মা'র শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দেখতে গিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল দুদিন থেকে আসব। তা এগুলোর জন্যে পারলে তো ? এই ও কি হচ্ছে ? শেষের উক্তিটি ছোট নন্দন-দুটির উদ্দেশ্যে। মিনিট কয়েক চুপ করে ছিল। বোধহয় নতুন মানুষ দেখে। তারপর যথারীতি কাজে লেগে গেছে। মা'র অগোচরে তার ব্যাগ খুলে চাবির গোছাটি সংগ্রহ করে দুজনে মিলে ট্রাঙ্কের তালায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে। অরুণা বড় ছেলেকে বলল, বাঁদর দুটোকে একটু সরিয়ে নিয়ে যা না, কারও সঙ্গে যে একটু কথা বলব,তারও কি উপায় আছে ?

আহা, কেন বকছিস ওদের ? এস, তোমরা আমার কাছে এস।

সেটা অবশ্য ওদের পছন্দ হল না। দাদার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে ওদিকটায় চলে গেল। সুলেখা বলল, এই তিনটি না আরও আছে ?

এর ওপরে আরও !···বড় বড় চোখ করে আঁৎকে উঠল অরুণা।

আমার কিন্তু বেশ লাগছে তোকে দেখে।

তা তো লাগবেই। আমার অবস্থায় পড়িসনি তো। দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিস। একেবারে ছাড়া গোরু।···বলে হেসে উঠল।

হাসি থামিয়ে বলল, বন্ধুদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস বললি না তো চার্চ দেখতে?

উঁ? একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুলতা, না, চার্চ দেখতে নয়। শুনলে তুই হাসবি।…মাছ ধরতে।

মাছ ধরতে! অরুণা হাসল না, দু'চোখ কপালে তুলল।

এখান থেকে মাইল দুই দূরে একটা ঝিল আছে না? সেখানে। আগেও এসেছিলাম একবার। ছিপ-টিপ ওখানে রাখা আছে একজনের বাড়িতে।

অরুণা তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বলল, মেয়েমানুষে মাছ ধরে? ছিপ ফেলে?

দোষ কী? তাছাড়া আসলে ওটাই তো মেয়েমানুষের ধর্ম।

অরুণা বুঝতে পারল না। বলল, তার মানে?

মাছ ধরার ব্যাপারটা জানিস তো? গোড়াতে কিছুদিন ধরে চার ছড়ানো, মাছকে ভুলিয়ে টেনে আনার জন্যে। তারপর টোপ ফেলে বসে থাকা, অপেক্ষা করা। অনেক মাছ আসে, ঘুর-ঘুর করে দু-চার বার শুঁকে চলে যায়, টোপ গেলে না। তারপর একটা হঠাৎ লোভ সামলাতে না পেরে গিলে বসে। তখন তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে, মানে রাসটা কখনও টেনে, কখনও একটু ছেড়ে দিয়ে ডাঙায় তোলার চেষ্টা। সবাই কি আর ওঠে? বেশীর ভাগই ছিটকে বেরিয়ে যায়। ভাগ্যের জোর থাকলে একটা হঠাৎ ধরা পড়ে, ঘরে আসে। বান্ধবীর মুখের পানে চোখ তুলে হাসল সুলেখা।

অরুণা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে। মুখ টিপে হেসে বলল, তোর ব্যাপারটা কী?

কেউ টোপ গেলেনি, না, গিললেও ঠিক মত খেলিয়ে তুলতে পারিসনি?

সে সব আরেকদিন। এবার চলি। ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

আরেকদিন নয়, আজই। ফেরার পথে। ওঁরা চলে যাবেন, তুই থাকবি আমার কাছে। এখান থেকে দশ মিনিটের পথ।

না ভাই, আজ হবে না। কাল আবার আফিস আছে তো। একটা ছুটির দিন দেখে আসব।

কেন বাজে বকছিস? আমার বাড়িতে যাবি না, তাই বল।

তুই দেখছি ঠিক তেমনি আছিস অরুণা। তেমনি কথায় কথায় অভিমান। বিশ্বাস কর। সত্যিই আসব। বিয়ের পরে তো তোকে আর দেখিনি। এত ভাল লাগছে! তোর সব কিছু দেখতে ইচ্ছে করছে, তোর উনি, ছেলে-পিলে ঘর সংসার…। ঠিকানাটা লিখে দে।

ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক আর ব্লাউজের আড়াল থেকে বেঁটে কলমটা বের করে বাড়িয়ে ধরল।

অরুণা রায় আর সুলেখা পাল একসঙ্গে পড়ত। আলাদা স্কুল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে একই দিনে ভর্তি হয়েছিল আশুতোষের মর্নিং সেকশনে। সেইদিনই আলাপ এবং কিছুদিন না যেতেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। বাইরের দিক থেকে তুজনের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। অরুণা রোগা বেশ ফর্সা, ভাসা-ভাসা টানা তুটো চোখ, একটু লম্বাটে ধরণের মুখ, কোমর ছাড়িয়ে ঘন চুল। সুলেখা মোটা-সোটা গোলগাল, বব করা চুল, রং চাপা, একটু কালোর দিকেই বরং বলা চলে। অরুণার বাবা রিটায়ার্ড পোস্ট-মাস্টার, ছোট্ট একখানা বাড়ি করেছেন বালিগঞ্জের দিকে, সামান্য পেন্সনে কোনরকম সংসার চলে। সুলেখার বাবা নামী অ্যাডভোকেট, ভবানীপুরে মস্ত বড় বাড়ি। লেখাপড়াতে অরুণা রীতিমত ভাল ছাত্রী, অল্পের জন্যে স্কলারশিপ পায়নি। সুলেখা মাস্টার-টাস্টার রেখে টায়ে-টায়ে সেকেণ্ড ডিভিশনে উতরে গেছে। অরুণার পক্ষে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া এবং ভালভাবে পাশ করে একটা চাকরি-বাকরি জোটানো অবশ্য প্রয়োজন, যাকে বলে মাস্ট; অনেক ভাইবোনের মধ্যে সে-ই বড়। সুলেখার কাছে কলেজে আসা-যাওয়া এবং সেই সূত্রে কিছুটা পড়াশুনা তার দৈনন্দিন রুটিনের অঙ্গ বিশেষ। অর্থাৎ খাওয়া-পরা, খেলাধুলো, গান-বাজনা

বেড়ানো, সিনেমা দেখা পার্টি-টার্টিতে যাওয়া ইত্যাদি দশটা ব্যাপারের মধ্যে ওটাও একটা। আসল লক্ষ্য একটি উৎসব-রাত যেদিন সে পাদবী বদল করে পুরনো বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠবে।

কিন্তু জীবন কি প্ল্যান মেনে চলে? অন্তত ওদের বেলায় চলল না। ডিগ্রি কোর্সের সেকেণ্ড ইয়ারে উঠতেই অরুণার বিয়ে হয়ে গেল। ওদের কে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় এসেছিলেন ওর বাবার কাছে কি কাজে। মেয়ে তখন কলেজ থেকে ফিরছে। এক নজর দেখেই বললেন, এটি কে?

আজ্ঞে, আমার মেয়ে; কলেজ থেকে ফিরল।

কি পড়ছে জেনে নিয়ে বললেন, বে-থার চেষ্টা করছ? অরুণার বাবা হাসলেন, ম্লান হাসি, যার অর্থ শুধু চেষ্টাতেই যদি মেয়ের বিয়ে হত! আত্মীয়টি বললেন, আমার প্রসূনের সঙ্গে লাগিয়ে দাও না। দিন আনা দিন খাওয়া অবসরপ্রাপ্ত পোস্ট মাস্টারের মনে হল ভুল শুনলেন না তো। প্রসূন বছর দুই আগে এম. এ পাশ করেছে, কোন্ একটা কলেজে পড়ায়, অতি সৎ, চরিত্রবান ছেলে এ সবই তিনি জানেন। আর তাঁর বাবা এই জমকালো চেহারার ভদ্রলোকটি ভাল চাকরি করতেন পুলিশের উপর মহলে। ব্যাণ্ডেলে মস্ত বড় বাড়ি, পুকুর বাগান জমিজমা। ব্যাঙ্কের অঙ্কটি ঠিক জানা নেই, তবে অনুমান করা শক্ত নয়।

ঐখানে বসেই পাকা কথা দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। অরুণা রাজী হতে চায়নি। কিন্তু যখন বুঝল কোন দূর ভবিষ্যতে চাকরি করে বাবাকে সে সাহায্য করবে ভাবছে তার চেয়ে এই বিয়েতে মত দিলেই তাঁর বেশি সাহায্য হবে, তখন আর আপত্তি করেনি। নাম-মাত্র খরচায় বিয়ে হয়ে গেল। এমন পাত্রে এমন ঘরে অরুণার বাবা-মার কাছে যা স্বপ্ন, হয়তো তার নিজের কাছেও॥ ওদিকে সুলেখার বাবা একদিন কোর্ট থেকে ফিরে বুকে ব্যথা বলে শুয়ে পড়লেন আর উঠলেন না। তারপর বোঝা গেল বাইরে থেকে

ওদের যতটা শাঁসালো বলে দেখাত ভিতরটা তেমনি ফাঁপা। ভাগ্যিস মা আগেই গিয়েছিলেন। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। দুজন দাদার একটি চাকরি সূত্রে আমেরিকায়, আরেকটি এখানেই ডালাপালা বিস্তার করে বসে গেছেন এবং সবটাই প্রায় বাবার ঘাড়ে। বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল। ভাগের ভাগ সামান্য কিছু পেল সুলেখা। তার সঙ্গে সদ্যপ্রাপ্ত এম. এ. ডিগ্রি সম্বল করে একটা ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠল। পুঁজি ফুরোবার আগেই শর্ট-হ্যাণ্ড শিখে ফেলল এবং চাকরিও জুটে গেল একটা। বিলিতি সওদাগারী অফিস। মাইনে ভাল।

মাসখানেকের মধ্যেই এসে গেল সুলেখা। খবর-টবর না দিয়েই। অরুণা যত না খুশি তার চেয়ে বেশি অবাক। সুলেখা যে সত্যিই আসবে তার এই পাড়াগেঁয়ে বাড়িতে এবং এত শীগগির সে একবারও ভাবেনি। ছুটির দিন নয়, একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে।

সকালে উঠেই তোর কথা মনে পড়ল। বেরিয়ে পড়লাম।

খুব ভাল করেছিস। চল, ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওঁর সঙ্গে গল্প-টল্প কর, চা-টা খা। আমি ততক্ষণে রান্নাটা সেরে ফেলি। আজ আবার ওঁর সকাল সকাল কলেজ।

প্রসূনবিকাশ ঘোষ নামক ভদ্রলোকটি অধ্যাপক, কিন্তু বাকপটু নন, যদিও বক্তৃতা তার পেশা। তার পরিধি ঐ ক্লাসরুমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার বাইরে কচিৎ মুখ খোলেন। একটি উচ্চশিক্ষিতা আধুনিকা প্রগল্‌ভা মহিলার সামনে তার অবস্থা রীতিমত কাহিল হয়ে উঠল। কথাবার্তা যেটুকু হল তা অপর পক্ষকেই চালাতে হল। তিনি কোনরকমে উত্তর দিয়ে গেলেন। তাতেই মনে হল যেন ঘেমে উঠছেন তিনি।

এটা লক্ষ্য করে 'আচ্ছা আপনি কাজ করুন' বলে সুলেখা যখন উঠল, ভদ্রলোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

চলে এলি যে? মাছের কড়ায় খুন্তি চালাতে চালাতে বলল অরুণা।

উনি পড়ছেন। তাই আর ডিস্টার্ব করলাম না।

পড়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, বিরক্তির সুরে বলল অরুণা, আসলে ও ভীষণ মুখচোরা।

ভালই তো।

ভাল না ছাই। তুই একটু বোস, আমার এখুনি হয়ে যাবে।

না, না, তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। তুই আস্তে আস্তে রাঁধ। আমি বরং বাইরেটা একটু ঘুরে দেখি। বাব্বা, কত বড় বাড়ি তোদের! তোর বাচ্চারা কোথায় গেল?

বড়টা বোধহয় পড়ছে। বাকি দুটো; এই তো এই মাত্তর ছিল এখানে। তোকে দেখে পালিয়েছে। একেবারে বুনো।

বুনো হলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই বশ মানল সুলেখার কাছে। নতুন মাসির কোল ঘেঁষে বসে বড় বড় চোখ করে ল্যাজকাটা বাঘের গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল। তারপরেই ফরমাশ হল, এবার ভালুকের গল্প বল। তারপর সেখানেই শেষ নয়, ভালুকের পরে এল সিংহ এবং শেয়াল আসবার আগেই তাদের মা এসে হাজির হল।

খুব জ্বালাচ্ছিস তো মাসিকে?

না, না, জ্বালাবে কেন? তুই ওদের বড্ড বকিস অরুণা। আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। অতটুকু ছেলে, দুষ্টু তো একটু হবেই, কিন্তু কি মিষ্টি দেখেছিস। কেমন ঠাণ্ডা হয়ে বসে গল্প শুনছে।

ঠাণ্ডা! একটা দিন থাক না, টের পাবি ঠাণ্ডা কাকে বলে। যা, তোরা খেলা করগে।···সত্যি ভাই, তিনটেতে মিলে আমার হাড়ে কালি দিয়ে ছাড়ল। এরপরেও কি নিস্তার আছে? এদিক-ওদিক চেয়ে গলা খাটো করল অরুণা, এবার বলছে, একটা মেয়ে চাই। ইচ্ছেকরে কোথাও পালিয়ে যাই। আর আমি পেরে উঠছি না।

সুলেখা মুখ টিপে হাসল, ভদ্দরলোককে দেখে তো মনে হল—

ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানেন না। কিন্তু ঐ—আসল জায়গায় একেবারে অন্য মানুষ।

তুই তো শক্ত হতে পারিস।

শক্ত! তাহলেই হয়েছে। এমন সব কাণ্ড করবে, বললে তুই বিশ্বেস করবি না।

সন্ধ্যার পর ফেরার গাড়িতে বসে একমাত্র ফেলে আসা এই একটি দিনের ছবিগুলো যখন চোখের সামনে পর পর সাজিয়ে দেখল সুলেখা, একটা কথাই মনে হল, অরুণা মুখে যা-ই বলুক আসলে সে সুখী, স্বামী পুত্র ঘর সংসার নিয়ে পরিপূর্ণ। সারাদিনে তার নিশ্বাস ফেলার অবসর মেলা ভার।

কিন্তু যখন মেলে সে নিশ্বাস তৃপ্তির নিশ্বাস।

রিকৃশায় উঠবার সময় অরুণা বলেছিল, আবার আসিস। সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, আসব। মাঝে মাঝে এসে একটা দিন এদের মধ্যে কাটিয়ে যেতে সত্যিই একটা তাগিদ বোধ করছিল মনের মধ্যে। শুধু তাগিদ নয়, লোভ। অরুণাকেও একদিন সময় করে ছুটির দিন দেখে আসতে বলেছিল ওর ফ্ল্যাটে। আমি তো যেতে পারলে বাঁচি। একটা দিন একটু হাড় জুড়োয়, সাগ্রহ উত্তর অরুণার, কিন্তু আমার অবস্থা তো দেখে গেলি। এব সব ফেলে নড়বার উপায় আছে?

এর পরের কথাগুলে মনে করে মনে মনে হাসল সুলেখা—তোকে দেখলে হিংসা হয়। বেশ আছিস। একেবারে ঝাড়া হাত পা। যা খুশি কর, যেখানে খুশি যাও। পেছন থেকে টেনে ধরবার কেউ নেই। আর আমাকে ছাখ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি।

ফ্লাটে ফিরে চারদিকটা বড় বেশী ফাঁকা ফাঁকা মনে হল। এতদিন তো হয়নি। এই তিনখানি ঘর—একটি শোবার একটি বসবার আরেকটি খাবার। শোবার ঘরের কেলে ছোট্ট একফালি দক্ষিণ খোলা বারান্দা, ধারে ধারে বসানো বেল, জুঁই রজনীগন্ধার টব, প্রতি ঘরে যত্ন করে সাজানো আধুনিক রুচির আসবাব, দরজা জানালায় সুদৃশ্য পরদা, সব মিলিয়ে এমন একটি শোভন সুরম্য পরিবেশ, যার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল সুলেখা।

যেখানেই যাক মন পড়ে থাকত এই ছোট্ট বাসাটির দিকে। কখন ফিরে এসে প্রশস্ত সোফা কিংবা কৌচের গভীর নরম বুকে, অথবা ছুটে গিয়ে ধবা দেবে কোমল শয্যার শুভ্র আলিঙ্গনে। বন্ধুরা ঠাট্টা করত, তুই বড্ড ঘরকুনো।

কি করব ভাই, হেসে কবুল করত সুলেখা, আমি আমার এই ফ্ল্যাটের প্রেমে পড়ে গেছি। একে ছেড়ে কোথাও গিয়ে মন টেঁকে না।

আজ তার কী হল কে জানে? কেমন একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখল সব। প্রতিটি বস্তুর ওপর যে প্রগাঢ় আসক্তি ছিল, কালও মর্মে মর্মে অনুভব করছে, হঠাৎ যেন উবে গেছে। মনে হল এগুলো যেন বড কৃত্রিম, নির্জীব, কোথাও কোন প্রাণের স্পর্শ নেই।

চোখের ওপর ভেসে উঠল আরেকটা বাড়ীর ছবি। চব্বিশ ঘণ্টা, মাকে বলে কাগ পড়ছে চিল উড়ছে। শোভা নেই, শৃঙ্খলা নেই। বিছানা বালিশ জিনিসপত্র সব অগোছালো, অবিন্যস্ত। তুটি অতি তুরন্ত শিশু ছুটছে লাফাচ্ছে, এটা ফেলছে, ওটা ভাঙছে, আর তাদের পিছনে সমান তালে চেঁচিয়ে চলেছে তাদের মা। তারই মধ্যে অথচ তার থেকে বহু দূরে বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে বসে আছে একটি মানুষ, সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত।

ছবিটা যেন চোখের সামনে থেকে সরতে চাইছিল না।

একটি বয়স্কা ঝি আছে সুলেখার। সারাদিনের। রান্নাবান্না, সব কাজ করে। সিঁড়ির পাশে একখানা ছোট্ট ঘর আছে, সেখানেই শোয়। জানতে চাইল, কফি বা চা কিছু দেবে কিনা। সুলেখা না বলাতেই চলে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, সরিৎবাবু ফোন করছিলেন। জানতে চাইলেন কখন ফিরবে তুমি। তুমি কী বললে?

বললাম, কলকাতার বাইরে গেছেন, হয়তো একটু রাত হবে।

আচ্ছা, তুমি যাও।

সুরিতের সঙ্গে সুলেখার ঘনিষ্ঠতা অনেক দিনের। চার পাঁচ বছরের কম নয়। সেটা যে একটু বিশেষ ধরণের তাদের [illegible] মহলের

অজানা নয়। সরিৎ ভাল চাকরি করে, বয়স বেশী নয়, চেহারা ভাল, গাড়ি আছে, নিজেই চালায়। তার পাশে সুলেখাকে প্রায়ই দেখা যায়। সিনেমা, রেস্তোঁরায়, পার্টি জলসায়, গঙ্গার ধারে বটানিকস্-এ ও 'ডাব্‌ল এস্' (বন্ধুমহলে ওদের সংক্ষিপ্ত নাম) পুরনো হয়ে গেছে। সরিৎ মাঝে মাঝে এই ফ্ল্যাটে রাত কাটায়, এ কথাও গোপন নেই। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, সেটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সুতরাং ও নিয়ে কারো মাথাব্যাথা নেই। 'মাঝে মাঝে'-টা কবে বারবার হয়ে দাঁড়াবে সেটাই আলোচ্য বিষয়।

ঝি চলে যেতেই সুলেখার মনের ভিতরটা কেমন যেন হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল। সরিৎ ফোন করেছে, সে আসছে, সে ওকে অমুক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলেছে—ঝিয়ের মুখে এ-খবর কতবার শুনেছে, এবং যখনই শুনেছে, অন্তরের মধ্যে একটা মধুর পুলক গুঞ্জন শুনতে পেয়েছে। আসঙ্গ লিপ্সায় বুকের ভেতরটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ তার কোনটাই অনুভূত হল না। তার জায়গায় কিসের যেন একটা ক্লান্তি ও অবসাদ এসে জুড়ে বসল। হঠাৎ মনে হল, এত বছর ধরে সে কোন পুরুষ-হৃদয়ের অধিকার পায়নি। সে শুধু প্রণয়িনী, নর্মসহচরী। তার বেশী আর কিছু নয়।

সরোর মা!

হঠাৎ উঁচু গলার ডাক শুনে ঝি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল।

শোন, সরিৎ যদি আবার ফোন করে, কিংবা এসেও পড়তে পারে, তাকে বল দিদিমণি বলে পাঠিয়েছে, আজ আর ফিরবে না। তারপরও সরোর মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে ধমকে উঠল, বুঝতে পারছ কী বললাম।

সে ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়ল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার খাবার দেব?

না; আমার খিদে নেই। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। বলে, শোবার ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

রাইটার

আগের দিন মহকুমা জেল থেকে যে সব কয়েদী চালান হয়ে এসেছে তাদের 'হিস্ট্রি-টিকেট' গুলো দেখতে গিয়ে জেলারবাবু লক্ষ্য করলেন, একখানা টিকিটের উপর দিকে অনেকখানি জায়গা কালি-মাখা। দোয়াত উল্টে গেলে যেমন হয়। তবে আপাততঃ তিনি যেটা চাইছিলেন—previous occupation কী, সেটা পড়া যায়। স্পষ্ট লেখা আছে writer। তার ঠিক পরের অংশ এবং সেইসঙ্গে কোন অপরাধে কত দিনের সাজা ইত্যাদি তথ্য গাঢ় কালিতে ঢাকা পড়ে গেছে। তা যাক। ওঁর এখনকার কাজ হল 'খাটানি পাশ' করা, অর্থাৎ কাকে কি কাজ দেবেন ঐ টিকিটে লিখে দেওয়া। সেই জন্যেই আগেকার পেশাটা জানা দরকার। খানিকটা সুবিধা হয়।

নাম ঠিকানায় কালি পড়েনি। কয়েদীটিকে ডেকে পাঠালেন। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক নমস্কার করে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে গড়ন, মুখে অল্প দাড়ি, প্রায় ঘাড় পর্যন্ত চুল, একটু এলোমেলো, মনে হল ইচ্ছাকৃত। চেহারায় হাবভাবে বেশ কিছুটা স্মার্টনেস আনবার চেষ্টা রয়েছে বোঝা যায়।

—তোমার নাম অনিল হালদার? জিজ্ঞাসা করলেন জেলার।

—আজ্ঞে স্যর।

—রাইটার, মানে পদ্য-টদ্য লেখ নাকি?

—এক আধটু, লেখক-সুলভ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল অনিল, বেশির ভাগ গল্প উপন্যাস লিখি।

—বেশ, বেশ। তা জেলে এলে কেমন করে? আদি-রসের ব্যাপার বুঝি?

অনিল উত্তর না দিয়ে মাথা নোয়াল। মুখের সেই হাসিটি অনেকখানি বিস্তৃত হল।

ভালই তো, মৃদু হেসে বললেন জেলারবাবু, ওসব বই শুনেছি বাজারে পড়তে পায় না। কিন্তু এ মামলায় তো জেলে আসা লাগে না শুনেছি। জরিমানা দিলেই চুকে যায়।

—আমি ইচ্ছা করেই এলাম। একটা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে যেতে চাই।

—বেরিয়ে গিয়ে কাজে লাগাবে? তবে তোমার যা লাইন, এখানে তার সুযোগ-সুবিধে কিছুই নেই। একেবারে নীরস নারীশূন্য জগৎ।··· সে যাক। এখানেও তোমাকে রাইটারের কাজ দেওয়া হল। আমরা বলি—convict writer কয়েদীদের চিঠিপত্তর দরখাস্ত লিখবে, অফিসের বাবুদের সাহায্য করবে।

একজন কেরানী জেলারবাবুকে কাগজপত্র এগিয়ে দিচ্ছিল। বলল, রাইটার তো আমাদের রয়েছে স্যর।

—তা হোক। একজন লেখককে তো আর মাকু চালাতে, র‍্যাঁদা ঘষতে কিংবা গম পিষতে দেওয়া যায় না।

অনিল বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে স্যর।

—বল।

—আমাকে দয়া করে সেল-এ থাকবার অনুমতি দিন। ব্যারাক অনেক লোকের মধ্যে—

—তোমার লেখার ব্যাঘাত হবে। বেশ সেল-এই থাকবে তুমি।

'আমদানী'-সেরেস্তার ডেপুটি জেলার নিখিল সেন বাংলায় এম,এ পাশ করে সবে ঢুকেছেন চাকরিতে। এখনও সাহিত্য-জগতের খবর-টবর রাখেন। লেখকদের সম্বন্ধে কৌতূহল আছে, শ্রদ্ধা আছে। তাঁরই দপ্তরে কাজ পড়ল অনিলের। খাতির করে বসালেন। (অফিসারের সামনে কয়েদীদের দাঁড়িয়ে থাকাই সাধারণ রীতি) বললেন, আপনার কোনো বই এখনো পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। দুএকটা নাম করুন তো। ভাবছি আনিয়ে নেবো।

—খালি খালি পয়সা খরচ করতে যাবেন কেন? সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল অনিল। আমি বেরিয়ে গিয়েই পুরো একসেট বই পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। আস্তে আস্তে পড়বেন।

বহু ধন্যবাদ। এখন নতুন কিছু ভাবছেন নাকি?

—না, তেমন কিছু—

—তাহলে শুরু করুন। লেখার পক্ষে জেল একেবারে আইডিয়াল জায়গা। নেহেরুর Discovery of India তো এখানে বসেই লেখা। কাজকর্ম আপনাকে কিছু করতে হবে না।...এই, ওঁকে এক দিস্তে সাদা কাগজ দিয়ে দাও তো। অফিসে যে সিপাই কাজ করে তাকে নির্দেশ দিলেন ডেপুটিবাবু।

মাঝে মাঝে নিখিল সেন যখন রাউণ্ডে বেরোন, অনিলের সেল-ব্লকে গিয়ে খোঁজখবর নেন, কি রকম এগোচ্ছে লেখা? কোন অসুবিধে নেই তো?

—আজ্ঞে না, অসুবিধে আর কী? তবে—

—বলুন।

অনিল ইতস্তত করতে লাগল। ডেপুটি জেলার ভরসা দিলেন, আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, অনিলবাবু। আমাকে সব বলতে পারেন।

—বেয়াদপি মাপ করবেন স্যর। জানেন তো লেখাটা যেমন নেশা, তার পেছনে তেমনি আর দুএকটা নেশার যোগান না দিলে—

—নেশা!

—হ্যাঁ, মানে একটু সিগারেটের ধোঁয়া, কখনো কখনো দুএক কাপ চা।

—স্মোকিং তো এখানে চলে না। আর চা-ও—আচ্ছা হয়ে যাবে।

—কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো স্যর।

—ধন্যবাদে কী হবে? তার চেয়ে অনেক বড় কিছু দিতে হবে। যাবার আগে একখানা উপন্যাস অন্ততঃ শেষ করা চাই।

খালাসের আগে কয়েদীদের খাতাপত্র সেন্সর করিয়ে নিতে হয়। জেলখানার আইন। নড়চড় চলবে না। তার মানে, অনিলের লেখাগুলোকে রেখে যেতে হবে। তখন, তখন তো আর অতবড় একটা বাণ্ডিল পড়ে দেখা সম্ভব নয়। রসিদ দেওয়া হবে। পরে একদিন সেটা দেখিয়ে যে কেউ এসে নিয়ে যেতে পারবে।

নিখিলবাবু বললেন, সেন্সর করা অবিশ্যি আমার কাজ নয়। তবে এটা আমিই দেখবো। অনেকদিন ধরে অনেক আগ্রহ নিয়ে বসে আছি।

—কিন্তু স্যর, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল অনিল, আমার যে কূলে এসে ভরাডুবি।

—কি রকম?

—প্রায় শেষ করে এনেছিলাম বইটা। এই সময়ে বাধা পড়লে—

—মুড চলে যাবে, নিজেই স্বীকার করলেন নিখিলবাবু। আচ্ছা দেখি, কী করা যায়।

তাঁর চেষ্টাতেই ব্যাপাটাকে 'স্পেশাল কেস' হিসাবে গণ্য করলেন সুপারিণ্টেডেণ্ট। তাঁকে বোঝানো হল এ তো রাজনীতিক রচনা নয়, সাহিত্য অর্থাৎ লিটারারী ম্যাটার্স, নিতান্তই নিরামিষ। সরকারের কোন ভাবনা নেই।

—আপনি আসবেন স্যর। ঠিকানা তো অফিসেই আছে। দোতলা বাড়ি! সামনে একটু বাগান করেছি। গেটের গায়ে নাম লেখা আছে। চিনতে অসুবিধে হবে না। যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেও দেখিয়ে দেবে।

—নিশ্চয়ই যাবো, অনিলকে গেটের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন নিখিলবাবু, আপনার লেখা আপনার মুখ থেকে শুনবো। এ কি কম কথা?

বারো বাই দুই বাই এফ গগন চৌধুরী লেন, বারাসত। অনেক খুঁজে খুঁজে বের করলেন নিখিল সেন। কিন্তু এ তো একটা বস্তি নম্বরে ভুল আছে নিশ্চয়ই। কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন? নিরর্থক।

এরকম জায়গায় একজন লেখকের পক্ষে থাকা অসম্ভব। কাছেই থানা। সেখানে গিয়ে বরং খোঁজ নেওয়া যেতে পারে।

ও-সি নিজেই ছিলেন। নামটা শুনে কপাল কুঞ্চিত করলেন, কি রকম দেখতে বলুন তো? বর্ণনা শুনে জানতে চাইলেন, ঠোঁট-কাটা?

—হ্যাঁ, ওপরের ঠোঁটে একটা কাটা দাগ আছে বটে।

—রাইটার বলেছে বুঝি?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—ঠিকই বলেছে। তবে ওর পরে আর একটা শব্দ আছে—'কনস্টেবল'। সেটুকু চেপে গেছে। এখানেই ছিল। অল্পস্বল্প লেখাপড়া জানা সিপাইদের আমরা অফিসের কাজে লাগাই। তাদের বলা হয় 'রাইটার কনস্টেবল।'

নিখিলবাবু শুনে থ। কালি ঢালা টিকিটের রহস্যটা এবার বোঝা গেল। বললেন, কেসটা কী?

—চুরি। তবে মারাত্মক কিছু নয়। একটা খাসী। হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল বস্তির লোকগুলো। জনতার ব্যাপার। বুঝতেই পারছেন। থানা ঘেরাও করে ফেলল। সেণ্ডআপ না করে উপায় ছিল না। জেল হয়ে গেল, চাকরিটাও গেছে।

ট্রেনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে মিহি-মোটা নানা সুরের ফেরিওয়ালার চিৎকার, ভিখারীর বেসুরো গান। হঠাৎ একটা চেনা গলা কানে যেতেই চমকে উঠলেন নিখিলবাবু—'মাইসোর চন্দন ধূপ। খাঁটি চন্দনকাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরি। মন মাতানো গন্ধ—'

কাছে আসতেই বললেন, অনিলবাবু যে; কী খবর?

প্রথমে একটু চমক! সঙ্গেসঙ্গে অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে উঠল ধূপওয়ালা, আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আর কাকে বলবো?

—কিন্তু আমার নাম তো অনিল নয়। তাছাড়া আপনাকে কখনো দেখেছি বলেও মনে হয় না।

—বলেন কি! এতদিন কাটিয়ে এলেন আমাদের ওখানে!

—আপনি ভুল করছেন, বলে আর দাঁড়াল না। ভিড়ের মধ্য থেকে দরাজগলা হেঁকে চলল, 'মাইসোর চন্দন ধূপ। খাঁটি চন্দন-কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরি। মাত্র পঞ্চাশ পয়সা প্যাকেট।'

নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে

"ভীষণ ভাল খবর। কী খাওয়াবে বল।"

মহাদেও শুকুল কাগজ পড়ছিল। একপাশে সরিয়ে রেখে দেখল রায় রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছে। অর্থাৎ খবরটা দেবার জন্যে তাকে অন্ততঃ তিরিশ মাইল বেগে সাইকেল ছোটাতে হয়েছে। সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে যোগ করল, চ্যাটার্জি চলে যাচ্ছে।

—ঠিক জানো?

—ঠিক মানে? কে, ষ্টোন থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এসে গ্যাছে। নিজের চোখে দেখে এলাম। তাব মানে তুমি এবার পাকছ। তোমার ওপরে তো আর কেউ নেই।

শুকুলের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। কিন্তু বাইরে বেশ খানিকটা নিস্পৃহভাব দেখিয়ে বলল, কাচা পাকা তো আর ওপরনীচের ওপর নির্ভর করে না। সবটাই মনিবের মর্জি। তুমিই না বলেছিলে কোন একজন বাঙালী লেখকের লেখা—দুনিয়ার সব কিছুই সময় হলে পাকে, যেমন কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা মাথা—শুধু চাকরির বেলায় সে নিয়ম চলে না। চাকরি পাকা হয় কালধর্মে নয়, তৈলধর্মে।

—আমি বলিনি, তবে কথাটা মিথ্যে নয়, আমাদের বস্‌টিও কিঞ্চিৎ তৈলভক্ত।

—তুমি তো সবই জানো ভাই, সরাসরি না হলেও এর ওর হাত দিয়ে তেল ঢালতে আমিও কিছু কসুর করিনি। আর কাজকম্ম?

সেদিক দিয়েও কোন দোষত্রুটি কেউ ধরতে পারেনি। কিন্তু কী যে চায় লোকটা। সেবার দেখলে তো? ঐ সময় বোস আমার দু বছরের জুনিয়ার। কি রকম ল্যাং মেরে এগিয়ে গেল।

—এগিয়ে গেল, তার কারণ বোস তার মিসেসটিকে ঠিক সময় বুঝে এগিয়ে দিয়েছিল। আসলে তিনিই কাজ হাঁসিল করে বেরিয়ে এলেন। তুমিও যদি অমনি—

একটু থেমে শ্রোতার মুখের পানে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল রায়। গলা নামিয়ে বলল, ব্যাপারটা এমন কিছু দোষের নয়। ব্যাচেলার মানুষ, বয়স হচ্ছে, বিয়ে থা করবে বলেও মনে হয় না। ফেয়ার সেক্স সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা আছে। কিন্তু কোনোরকম বদ-দোষটোষ আছে বলে শুনিনি। নাইট ক্লাবে-টলাবেও যায় না। অফিসে যেসব মেয়ে আছে, তাদের কারো সঙ্গে কোন অভদ্র ব্যবহার করেছে বলেও শোনা যায়নি। ওর ইচ্ছে মাঝে মাঝে দু-একটা সন্ধ্যা তোমাদের মত সিনিয়র স্টাফের কারো বাড়িতে গিয়ে একটু বসা। তাদের স্ত্রীরাও থাকেন। এক কাপ চা বা কফির সঙ্গে কিছুক্ষণ একটু গল্প-গুজব। বোস অবিশ্যি একটা ছোট-খাট পার্টিও দিয়েছিল। বেছে বেছে কিছু মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেসদেরও নেমন্তন্ন করেছিল। আমাকে ডাকেনি। আমার তো আর মিসেস-ফিসেস নেই। তোমাকে নিশ্চয়ই ডেকেছিল।

—হ্যাঁ; কিন্তু আমি যাইনি।

না যাবার কারণটা যে মিসেস-ঘটিত সেটাও ব্যক্ত করল শুকুল। সেই সঙ্গে আরো কিছু পারিবারিক খবর, যা প্রণব রায়ের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও আগে কখনো বলেনি। তবে ঐ ব্যাপারে মহাদেও শুকুলের মনে কোথাও একটা কাঁটা বিঁধে আছে, যা তাকে স্বচ্ছন্দ হতে দিচ্ছে না। এটুকু জানতে রায়ের বাকী ছিল না। ওরা দুজনেই বেশ বড় ও নামী কমার্শিয়াল ফার্মের কিছুটা উপরের স্তরের লোক। রায় বছর কয়েক আগে সেল্‌স্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভ থেকে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে গিয়ে পৌঁছেছে। শুকুল সেইখানেই পড়ে আছে বেশ কিছুদিন।

এতদিনে কনফার্মড্ হবার কথা। হচ্ছে না। তার আগে যারা ঢুকেছে তাদের মধ্যে দু-তিনজন তাকে ছাড়িয়ে গেছে। একজন তো ডিভিশন্যাল ম্যানেজারের গদিতে গিয়ে উঠেছে।

মহাদেও শুকুল কাজের লোক। বুদ্ধি আছে, পরিশ্রম করতে পারে, চটপটেও কম নয়, কিন্তু তার বেশির ভাগ সহকর্মীর মত 'চটকদার' নয়। হয়তো সেই কারণে সে অফিসে খানিকটা কোণঠাসা হয়ে আছে। অথবা বলা যেতে পারে ঐ কোণটা সে নিজেই বেছে নিয়েছে। সমস্তরের লোকেদের সঙ্গে তার সৌহার্দ্য আছে কিন্তু ততটা অন্তরঙ্গতা নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রণব রায়, যদিও তাদের বয়সের তফাৎ সাত-আট বছর।

রায় প্রায়ই আসে ওর বাড়িতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প গুজব করে, চা—খাবার খায়। আগে আগে 'শুকুলের' এর পর একটা 'দা' যোগ করত, ইদানীং তাও করেনা। সে জানে এবং লক্ষ্য করেছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে মহাদেও শুকুল একমাত্র তাকেই জানে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছে, এতদিনের এতটা ঘনিষ্ঠতা, তবু শুকুল তার বৌকে কোনোদিন ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি। অথচ তিনি বাড়িতেই আছেন এবং প্রচুরভাবে আছেন, ইংরেজিতে যাকে বলে very much in existence. একটু চড়া গলায় কথা বলেন ভদ্রমহিলা, তার অনেক কিছুই পরদা ভেদ করে বসবার ঘরে এসে ঢোকে। তিনটি ছেলে-মেয়ে শুকুলের। বয়স সাত থেকে তিনের মধ্যে। মার হাতের চড়টা-চাপড়টা পিঠে পড়ে—এবং সেটা বেশ উদারভাবেই পড়ে—তাদের গগনবিদারী চিৎকার, কিংবা 'নকর ও দাই'দের ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে মালিকানীর একটু দেহাতী ধরনের তর্জন-গর্জন মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তাকে প্রায় অচল করে দেয়। শুকুলের মুখে তখন কতগুলো বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। কখনো পরদার উপর একটা অসহায় দৃষ্টি। মাঝে মাঝে এও বোঝা যায় বন্ধুর সামনে সে বেশ খানিকটা লজ্জিত বোধ করছে। বোধহয় কিছু একটা বলতেও গেছে দু-একদিন। কিন্তু বলেনি।

সেদিন ঐ জাতীয় কোন ঘটনা ঘটেনি। বরং পর্দার ওধারে একটা অস্বাভাবিক নীরবতা শুরু থেকেই টের পাচ্ছিল রায়। হয়তো সেই কারণে শুকুল মনে মনে একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল এবং নিজেকে অতখানি মেলে ধরতে পেরেছিল বন্ধুর কাছে। তাছাড়া রায় যে খবরটা বয়ে এনেছিল এবং 'কাজ হাসিলের' পন্থা হিসাবে যে ইঙ্গিত দিয়েছিল সেই সূত্রেই তার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় খোলাখুলি তুলে ধরা ছাড়া শুকুলের বোধহয় আর কোন উপায় ছিল না।

মহাদেও শুকুল দ্বারভাঙ্গা জেলার কোনো এক দূর গ্রামের গরীব পরিবারের ছেলে। বাপ গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবু যে মহাদেও সহরের স্কুলে ভর্তি হল এবং হবার সুযোগ পেল তার পেছনে ছিল তার এক শিক্ষকের (যিনি ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়) আনুকূল্য ও নিজের কৃতিত্ব। পিতৃদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে বি-এ পাশ করে বেরিয়েছিল, কিন্তু তার আগেই তাঁর একটা প্রচণ্ড ও অলঙ্ঘ্য ইচ্ছার বোঝা ঘাড়ে না তুলে পারেনি। বেশি কিছু নয়, তাঁরই কোনো বাল্যবন্ধুর একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কন্যা। শুধু বর্ণ নয়, নববধূর মুখশ্রী সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীরা যে মত ব্যক্ত করেছিল সেটা গোপনে এবং নিজেদের মধ্যে বরের মার সামনে বলবার মত নয়। কিন্তু দুদিন না যেতে তিনি নিজেই দেখলেন বধূমাতার মুখশ্রীকে ছাড়িয়ে গেছে তার মুখ। সোজা বাংলায় যার নাম চোপা। তারা নাকি এদের চেয়ে বংশে ও অবস্থায় বড। নিজের বাপের বাড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে সে যখন-তখন শ্বশুর-শাশুড়ীর বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ত।. মহাদেও বেঁচে গিয়েছিল। সে তখন কলকাতায় চাকরির সন্ধানে ঘুরছে। চাকরিটি যেই জুটল, বাপ-মা বললেন, 'বাবা, এবার একটা বাসা কর। তা না হলে তোমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে।' বৌ-এর ও সেই মত। তার 'মরদের' যখন 'নকরি' হয়েছে, ভাল 'নকরি,' তখন সে আর গাঁয়ে বসে বুড়োবুড়ীর তাঁবেদারি করতে যাবে কেন?

রাজেশ্বরী যে তাদের চেয়ে আরো বিশুদ্ধ ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে সেটা একদিক দিয়ে শাপে বর বলে মনে করল শুকুল। পরপুরুষের সামনে সে কখনো বেরোবে না। স্ত্রীর 'মুখশ্রী' নিয়ে তার ভাবনা ছিল না, ভয় ছিল তার 'শ্রীমুখ' নিয়ে। সেখান থেকে কখন কী 'বাক্যসুধা' নির্গত হবে, কে জানে? প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সহকর্মীরা বেড়াতে আসত। একা এলে 'মিসেস' কেন বেরোচ্ছে না তার একটা কারণ ভেবে-চিন্তে খাড়া করা যেত। কিন্তু মুসকিল হত স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে এলে। তখন বাধ্য হয়েই শুকুল স্বামীটিকে বাইরের ঘরে বসিয়ে স্ত্রীটিকে নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকত। আলাপ করিয়ে দিত 'আমার বন্ধু অমুকের স্ত্রী।' কিন্তু ও পক্ষ থেকে এইসব 'আজকালকার বেহায়া মেয়েমানুষের' সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা বা আগ্রহ জেগে উঠবে, এটা আশা করাই অন্যায়। মেয়েমহলে কোন কথাই চাপা থাকে না। ব্যাপারটা জানা-জানি হতে সময় লাগেনি। তখন আর কেউ আসত না। শুকুলও বেঁচে গেল।

রায় যখন উঠল বেশ রাত হয়েছে। এতক্ষণ ধরে যে কাহিনী শুনল সে সম্বন্ধে কিছু বলল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, বৌদি বুঝি এখানে নেই?

শুকুল হাসল—সেটা কি এতক্ষণেও বুঝতে পারেনি?

রায় সে হাসিতে যোগ দিল না। মনে হল যেন কিছু-একটা ভাবছে। জানতে চাইল, কবে ফিরছেন?

—তা দশ-বারো দিন তো লাগবেই। বাপের বাড়ি গেছে। ভাইএর বিয়ে পরশু।

—তুমি যাচ্ছ না?

—না। ছুটি পাইনি বলে কাটিয়ে দিয়েছি।

চার-পাঁচ দিন পরে রায় সন্ধ্যার দিকে ঘুরে ঢুকতেই শুকুলের কড়া অনুযোগ—ব্যাপার কী বল তো? সেই যে গেলে আর এমুখো হবার নামটি নেই!

—ব্যাপার তো তোমার।

—আমার! তার মানে?

—শোনো, ভেতরের খবর যতটা পাওয়া গেল নর্মাল কোর্সে কিছু হবে না। সিনিয়রিটির কোনো প্রশ্ন নেই। জি. এম. যাকে যোগ্য মনে করবে তারই গলায় মালা পড়বে। ওকে হাত করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না।

—জানি, এবং সে উপায় আমার হাতে নেই বলেই ও নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ঘনশ্যাম দাস অরোরার মত রাঘব বোয়ালের খাঁই মেটাবার সাধ্য আমার নেই, কোনকালে হবেও না।

ঐটা তুমি ভুল শুনেছ। লোকটার আর যা-ই দোষ থাক টাকা-পয়সার লোভ নেই।

—তার বদলে আর যা চায়, মানে তুমি সেদিন যা বলেছিলে, আমার বেলা সে প্রশ্নই ওঠে না। সেটা তুমি ভাল করেই জান। যাক্, এবার তোমার খবর বল। বাইরে-টাইরে যাচ্ছ নাকি এর মধ্যে?

রায় কোনো উত্তর দিল না। ভাবতে লাগল। দু-একবার একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর মৃদু হেসে বলল, একটা কথা বলবো?

—বল না?

—ব্যাপারটা শুধু তোমাব আর আমার মধ্যে থাকবে। কেউ জানবে না। একেবারে টপ্ সিক্রেট।

—আচ্ছা, আচ্ছা। ভূমিকা-টুমিকা ছেড়ে এবার বলে ফেল দিকিনি।

কিছুটা শুনবার পরেই একেবারে লাফিয়ে উঠল শুকুল—তুমি ক্ষেপেছ! তাই কখনো হয়?"

—কেন হবে না শুনি? যে দেবতার যে পুজো। তুমি তো বামনের ছেলে। নিশ্চয়ই দেখেছ, মা কালীর রক্তজবা না হলে চলে না, আর শিবঠাকুরের চাই ধুতরো ফুল!

—তাই বলে তুমি যা বলছ—

—কিছু অন্যায় বলিনি। এমন কিছু কঠিনও নয়। সে সব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।······তাছাড়া তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার বাপ-ঠাকুরদার আমলের 'উচিত অনুচিত' কি তুমি আঁকড়ে ধরে রাখতে পেরেছ? তাঁদের সংস্কার, আদর্শ, রীতিনীতি সবকিছু থেকে অনেক দূরে চলে আসনি? এই মাত্তর তুমি অরোরাকে ঘুষ দেবার কথা বলছিলে। ক্ষমতা থাকলে হয়তো চেষ্টা করেও দেখতে। কথাটা যদি তোমার বাবার কানে যেত—

—ওরে বাপরে! শোনামাত্তর সোজা গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ।

—তবে? আমরা যে যুগে এসে পড়েছি, তার ধর্ম মেনে নিয়ে সেই ধারা বেয়ে চলতে হবে। এখন আর ন্যায়-পথ বলে কিছু নেই, থাকলেও সেখান দিয়ে কেউ চলে না। চলতে গেলে পড়ে পড়ে মার খাবে। এগোতে পারবে না, যেটা তোমার লক্ষ্য সেখানে কখনো পৌছাতে পারবে না। Honesty is the best policy এই জাতীয় maxim স্কুলের ছেলে-মেয়েদের Essay বই ছাড়া অন্য কোথাও দেখতে পাচ্ছ? ওটা তাদেরও কাজে লাগে না, পরীক্ষার হল-এ উল্টোটাই বরং কাজ দিচ্ছে। আর "সত্য বই মিথ্যা বলিব না" এই নীতি বাক্যটিও শুধু এক জায়গায় টিকে আছে। আদালতের কাঠগড়ায়। সাক্ষী দিতে গিলে আওড়াতে হয়। কিন্তু সবাই জানে ওর আসল মানে হল 'মিথ্যা বই সত্য বলিব না।'

এতক্ষণে একটানা বকে গিয়ে রায় বোধহয় একবার দম নেবার জন্যে থামল। শ্রোতার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। সোফার পিঠে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে সিগারেট টেনে চলেছে।

"কী হল দাদা, এতবড় একটা লম্বা বক্তৃতা শুনে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?"

"উ?"—চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল শুকুল। আস্তে আস্তে বলল, তোমার ঐ বক্তৃতা এখন পুরনো হয়ে গেছে। ও সবই আমি জানি। কিন্তু জানা আর করা তো এক জিনিস নয়।

—করার ভার আমার। সে তো গোড়াতেই বলেছি। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দিন তিনেক পরে জেনারেল ম্যানেজাব অরোরা সাহেবেব চেম্বারেব সামনে গিয়ে দাঁড়াল শুকুল—“আসতে পাবি স্যার।”

—কাম্ ইন।……ইয়েস? ফাইল থেকে মুখে না তুলেই বললেন জি. এম.

—আসছে শনিবার বিকেলে কি আপনাব কোনো অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে স্যাব?

—না; কেন বল দিকিনি? এবাবে চোখ তুললেন অবোরা।

—আমার বাড়িতে সামান্য-একটু চায়েব আয়োজন কবেছি। দয়া করে যদি একবার—

—কী ব্যাপাব?

আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা আপনি আমাদেব বাড়িতে একবাব পায়েব ধুলো দেন। অনেকদিন থেকেই বলছে আমাকে। আমি ঠিক সাহস কবিনি স্যার।

অরোরা সাহেব হেসে উঠলেন—“এতে ভয়েব কী আছে? তোমাব স্ত্রীর যখন এত ইচ্ছা, আই মাস্ট বেসপেক্ট হাব উইশেজ। ক’টাব সময়?”

—ছটা।

—ও-কে। আই উইল গো।

শনিবার ওদের ছুটি! বেলা দশটা নাগাদ চৌরঙ্গী পাড়া থেকে একটি ভাল বাবুর্চি সঙ্গে করে এসে পড়ল রায়। মেন্যু আগের দিনই ঠিক হয়ে গেছে। জিনিসপত্র কতক এসেছে, কতক আসছে। বাবুর্চি সব বুঝে-সুঝে নিল। শুকুলের নকর আর দাই—এতদিন যারা কাজ করছিল তাদের কয়েক দিনের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ‘মাইজী’ ফেরার ঠিক আগে এসে পড়বে। রায় আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। ‘গোটা তিনেক নাগাদ আসছি’ বলে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল।

ঐ সময়টা তুমি থাকলে বড় ভাল হত ভাই—অনুনয়ের সুরে বলল শুকুল। এ সম্বন্ধে আগেই কথা হয়ে গেছে। রায় বুঝিয়ে দিয়েছে সেটা ঠিক হবে না। তার সামনে সাহেব তেমন 'ফ্রী ফীল' করবে না। সেই কথাই আরেকবার বোঝায়। শুকুল তখনো 'কিন্তু কিন্তু' করছিল। রায় মুচকি হেসে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? যাকে নিয়ে আসছি সে একাই সবটা ম্যানেজ করে নেবে। তোমার কাজ শুধু হাজির থাকা আর জায়গা বুঝে এক আধটু হেঁ হেঁ করা, ব্যাস্।

ঠিক তিনটাতেই এসে পড়ল প্রণব। ট্যাক্সি করে এসেছে। তার পিছনে একটি মহিলা। শুকুল বাইরের ঘরেই ছিল। উঠে দাঁড়াতেই পরিচয় করিয়ে দিল, "মিষ্টার শুকুল, মিস্ সুপর্ণা ঘোষ।" নমস্কার বিনিময়ের পরেই সরাসরি কাজের কথা পাড়ল রায়—ব্যাপারটা তো আপনাকে আগেই বলেছি মিস্ ঘোষ, মিষ্টার শুকুল একজন পদস্থ অফিসার। ওর বস্, মানে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারকে চায়ের নেমতন্ন করা হয়েছে। মিসেস শুকুল নিজে উপস্থিত থেকে মান্য অতিথিকে আদর—আপ্যায়ন করবেন এটাই দস্তুর। কথাও ছিল তাই। কিন্তু হঠাৎ বাবার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে তাঁকে দেশে চলে যেতে হয়েছে। এদিকে টী-পার্টি তো আর অপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর না থাকাটা বস্ মোটেই ভালভাবে নেবেন না। কাজেই—বাকিটা বলবার আগেই সুপর্ণা মুখ টিপে হাসল—"আমাকে তাঁর হয়ে প্রক্সি দিতে হবে। এই তো?"

—শুধু প্রক্সি নয়, তার রোলটা আগাগোড়া প্লে করতে হবে। সেটা আর আপনাকে বলতে হবে কেন? ষ্টেজে ছাড়াও আপনি তো মাঝে মাঝে রেডিওতে অভিনয় করে থাকেন। কোনো আর্টিষ্ট যদি আসতে না পারেন, অন্য একজন নামেন তার জায়গায়। তার আগে একজন গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন—"নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে—"অ্যাণ্ড সো অন্।

আকাশবাণীর একজন বিশেষ ঘোষকের কণ্ঠ ও বলার ধরন এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে শোনাল যে শুকুল ও সুপর্ণা দুজনেই

হেসে উঠল। রায় তেমনি গম্ভীরভাবেই বলল, আপনার বেলায় কিন্তু কোন ঘোষণা বা জানাজানি হবে না। বরং আমাদের গেষ্ট জানবেন আপনিই নির্ধারিত শিল্পী। বুঝলেন তো?

সুপর্ণা মাথা নেড়ে জানাল—বুঝেছি! তারপর গল্পচ্ছলে রেডিওর কথাই পাড়ল—"সেদিন আমাকে অমনি এক নির্ধারিত শিল্পীর রোলে নামতে হয়েছিল। মেইন্ পার্ট। যার করবার কথা, বিখ্যাত আর্টিস্ট, নামটা আর করতে চাই না। আপনারা সবাই জানেন। এ. আই. আর. থেকে এক ভদ্রলোক এসে হাজির। ড্রামা সেকশনের খোদ কর্তা বলে পাঠিয়েছেন, ভীষণ জরুরী, না গেলে চলবে না।

রায় বলল আমাদের এটা তার চেয়েও জরুরী। এবার তাহলে আপনি রেডি হতে থাকুন। তার আগে যদি আর কিছু জানবার-টানবার থাকে—

—জানবার আর কী? ভদ্রলোক একা আসছেন না তাঁর স্ত্রীও থাকবেন?

—স্ত্রী কোথায়? কনফার্মড্ ব্যাচেলর। চল্লিশের ওপর বয়স। তাহলেও মেয়েদের ব্যাপারে, কী বলবো?

—যাক আর বলতে হবে না। আমি বুঝে নিয়েছি। শুধু একটা ছোট্ট মুশকিল হল, হিন্দীটা এখনো তেমন রপ্ত করতে পারিনি। ইংরেজিও—

কী দরকার? আপনি বাংলা বলবেন। অরোরা অনেকদিন আছে কলকাতায়। পরিষ্কার বাংলা বলে। বোঝে তো বটেই।

—"কিন্তু", শুকুলের দিকে তাকাল সুপর্ণা, "উনি তো বোধহয়—"

হ্যাঁ, উনি বিহারের লোক, কিন্তু ওঁর স্ত্রী বাঙালী।

শুকুল চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়ল, রায় তার দিকে চেয়ে ঘন ঘন চোখ টিপছে।

শুকুলের বাড়িতে আলাদা খাবার ঘর নেই। ডাইনিং চেয়ার-টেবিলের প্রশ্নই ওঠে না। বসবার ঘরেই সব ভাড়া করে এনে বসানো হয়েছে। নতুন পরদা ফুলটুলের ব্যবস্থাও আছে। সুপর্ণা

সেগুলো একটু তদারক করল, এখানে-ওখানে সামান্য এক-আধটু নাড়া-চাড়া করে বলল, দেখুন ঠিক হয়েছে তো ?

"চমৎকার" উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠল রায়, 'এ নাহলে হয় ? সবকিছুর বেলাতেই ফাইন্যাল টাচ্ হ'ল ফেমিনিন টাচ্। আচ্ছা এবার তাহলে চলুন আপনাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দেওয়া যাক। আপনার শাড়ি জামা, এবং যাকে বলে প্রসাধন সামগ্রী সব এই সুটকেস আছে। আপনি যেমন যেমন বলেছিলেন। একবার বব' দেখে নিন।'

'ঠিক আছে' বলে উঠে পড়ল সুপর্ণা। প্রণবও শুকুলকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে তিনজনে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'এটিকে পেলে কোথায় ?' বাইরের ঘরে ফিরে এতক্ষণে প্রথম কথা বলল শুকুল।

—অনেক কষ্টে জোটাতে হয়েছে দাদা। নামকরা অ্যাকট্রেস। ভাল ভাল অ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করে বেড়ায়। ভীষণ ডিমাণ্ড। আজকেই কোথায় যেন আটকা পড়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুটা বেশী কবুল করে রাজী করিয়েছি। চেহারা দেখেছ ? এর ওপর সেজেগুজে যখন বেরোবে, দেখো। কী স্মার্ট ! তেমনি ফরওয়ার্ড। আর গলাটা ? অরোরা যে-সব বাড়িতে যায় তাদের গিন্নীদের তো আমার দেখা আছে। এর পায়ের নখের কাছেও দাঁড়াতে পারে না। ব্যাটা একবারে ফ্ল্যাট্ হয়ে যাবে, দেখে নিও।

রায় বিশেষ অত্যুক্তি করেনি। অরোরা কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি, মহাদেও শুকুলের মত ঐ রকম একটা সেকেলে ধরণের ম্যাড়মেড়ে চেহারার লোক, যাকে প্রায় গেঁয়ো বললেই চলে, তার এমন একটি ব্রাইট বৌ থাকতে পারে। কেবল রূপের জলুস নয়, এর চাহনি, এর হাসি, চলা ফেরা, কথাবার্তা—সবকিছু থেকেই যেন একটা দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। শুধু বিস্মিত নয়, অনেকটা যেন বিমোহিত হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক।

"কই, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না"—সুপর্ণার সুরেলা কণ্ঠে

মধুর অভিযোগের সুর, চিত্রিত ভ্রূযুগলে ছদ্মশাসন, ওষ্ঠে রঙিন হাসি।

"খেয়ে কুলোতে পারছি কই?" বলে একটা কাটলেটের টুকরো কাঁটায় গেঁথে মুখে পুরলেন অরোরা সাহেব। চিবোতে চিবোতে মুখ তুলে বললেন।

—আপনি তো বসলেন না আমাদের সঙ্গে।

—এই তো এবার বসবো।

ডাইনিং চেয়ার, হাতল নেই। অতিথির চেয়ারের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে একেবারে তাঁর গা ঘেঁসে বসল। বাহু গলা এবং তার নীচেও কিছুটা অংশ অনাবৃত। খেতে খেতে পাশের দিকে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল—আপনাকে আর একটা কাটলেট দিই?

—সর্বনাশ! এর পরে আবো?

—জাষ্ট্ একটা; প্লীজ—অনুরোধের স্বরে অনেকখানি আবদার-ঢেলে দিল সুপর্ণা। তারপরেই মিষ্টিগলায় ঝঙ্কার তুলে ডাকল—বয়। কাট্লেট্ এল। অরোরা আর 'না' বলতে পারলেন না।

'টী' তো নয়, রীতিমত 'হাই-টী'। তার সঙ্গে হাসি-গল্পের আসর। ভোজন পর্বের পরে ও তার জের চলল কিছুক্ষণ। তার মধ্যে গৃহকর্তার ভূমিকা অতি সামান্য। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা। কথার স্রোত বইয়ে দিলেন 'গৃহিণী'। তার যেন আর শেষ নাই।

যতটা সময় কাটাবেন বলে এসেছিলেন তার বেশ কিছুটা পরে বিদায় নিলেন অতিথি। 'শুকুল দম্পতি' তাঁকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেখানে বসেও তিনি ওদের আরেক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন এবং সেটা সুখী ও পরিতৃপ্ত মনের ধন্যবাদ।

কিছুক্ষণ পরেই রায় এসে পড়ল। মিসেস শুকুলের ভোল পালটে সুপর্ণা ঘোষ (আসল নাম সরলা, বিমলা কিংবা ঐরকম একটা কিছু) তখন যাবার জন্যে তৈরি। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর কিছু বখশিস এবং অনেক ধন্যবাদ নিয়ে ট্যাকসিতে গিয়ে উঠল। সঙ্গে

সঙ্গে রায়ও একলাফ দিয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে—কনগ্রাচুলেশন্‌স্‌।

—"মানে? এরই মধ্যে এতখানি উচ্ছ্বাসের হেতুটা ঠিক ধরতে পাবল না শুকুল। রায় তাব হাত ধরে জোরে জোবে ঝাঁকানি দিযে প্রায চেঁচিয়ে উঠল, কেল্লা ফতে।

—আঃ, ব্যাপারটা কী, বলবে তো?

—গড়িয়াহাটার মোড়ে দেখা হয়ে গেল।

—অ্যাঁ! তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কি?.........খাবার টাবার কিছু আছে?

—সব আছে। ঐ তো। বাবুর্চিকে দিয়ে সাজিয়ে রেখে দিয়েছি।

—আচ্ছা, দাঁড়াও। তাজ্জব খববটা আগে জানিয়ে দিই। আশ্চয যোগাযোগে। বেড সিগন্যাল দেখে সাইকেল থেকে নেমেছি। ঠিক পাশেই কালো বুইক। দেখে ফেলেছে। অন্যসময হলে না দেখাব ভান করে চলে যেত। কিন্তু মুখ দেখেই বুঝলাম বেশ খোশ-মেজাজে আছে। 'রায় না?' একটা গুড ইভিনিং দিলাম। 'তুমি এদিকে থাক নাকি'? আজ্ঞে না স্যার, আমি থাকি নর্থে। একটু শুকুলেব ওখানে যাচ্ছি। ইচ্ছা করেই বললাম। 'ও' তাই নাকি? আমি তো সেখান থেকেই আসছি। হি ইনভাইটেড মী টু টী। খুব খাওয়ালে। ভেবী নাইস পীপল। পারটিকুলারলী হিজ ওয়াইফ।

'হ্যাঁ, স্যাব মহিলাটিব ব্যবহাব-ট্যবহাব বেশ ভালো'

ওহ্‌ শী ইজ ওয়াণ্ডাব-ফুল'।

আবো কি সব বলতে যাচ্ছিল। হতভাগা সিগন্যাল তখন গ্রীণ হয়ে গেছে। যা বুঝলাম ওব হয়ে গেছে। তার মানে তোমারও হয়ে গেছে ধরে নিতে পার। ঠিক দাওয়াই পড়েছে এবার।

শুকুল হাসিমুখে বলল, ছাখ। আমাব নসিব আর তোমার হাতযশ।

কয়েকদিনের মধ্যেই শুকুলের মনে হল ভাগ্যের চাকা বোধহয়

ঘুরতে আরম্ভ করেছে। ডেপুটি সেল্‌স্‌ ম্যানেজার গুপ্তসাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁব সঙ্গেই ওর কাজকর্মের সরাসর সম্পর্ক। বল্লেন, অনেকদিন তো বাইরে যাওনি, এবার আসামের দিকটা ঘুরে এসো। কবে বেরোবে?

—যেদিন বলবেন।

চলে আসছিল। আবার ডেকে ফেরালেন। গলা খাটো করে বললেন, জি- এম তোমার কাজকর্মের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। আমার যতটা বলবার বলেছি⋯ ⋯উইশ ইউ গুড লাক্‌।

পরদিন ট্যুরে বেরোবার আগে কাগজপত্র গোছাচ্ছে। জি-এম-এর কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিষ্ট্যান্ট চুপি চুপি বলে গেল, কাউকে বলবেন না। আপনার পার্সনাল ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছেন সাহেব।

আর এক টুকরো আশার আলো। খবরটা তখনই রায়কে না জানিয়ে পারল না। প্রণব ভীষণ খুশী—"আমি বলিনি? ঘুরে এসো। মনে হচ্ছে তাব আগেই অর্ডার বেরিয়ে যাবে।"

লম্বা প্রোগ্রাম। দিন দশেক লেগে গেল ফিরতে। তার আগেই সপুত্র-কন্য রাজেশ্বরী ফিরে এসেছে। ভাই-এর বিয়ে মিটে গেছে। তার ছোটভাইটির কলেজে গরমের ছুটি চলেছে। সে-ই এসেছে দিদিকে রেখে যেতে। অফিসের বেলা হয়ে গিয়েছিল কারো সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হল না। নাকে-মুখে দুটো গুঁজেই বেরিয়ে পড়ল শুকুল।

ওদিকে কাজের পাহাড় জমে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলার অবসর নেই। তারই মধ্যে পিওন এসে একটা বন্ধ কভার দিয়ে গেল। উপরে ওর নাম। বুকের ভিতরটা নেচে উঠল। সত্যিই তাহলে অর্ডার বেরিয়ে গেছে!

তাড়াতাড়ি খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়েই মাথাটা ঘুরে গেল। ভুল দেখছে না তো! আরেকবার পড়ল। না, ঠিকই দেখেছে। অর্ডার ঠিকই। তবে বিষয়টা কনফারমেশন নয়, বদলি। তাও আবার বম্বেতে, যেখানে কেউ যেতে চায় না।

কোম্পানী বাড়িভাড়া বলে যা দেয় তাতে 'বাড়ি' দূরে থাক একচিলতে বারান্দাও মেলে না। তাক উপরে সব জিনিস আগুন। সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক খবর ছিল শেষের দিকে। সেলস থেকে সরিয়ে ঠেলে দিয়েছে অ্যাকাউন্টস-এ। অর্থাৎ স্রেফ কেরাণীগিরি। ট্যুরফুর নেই, কোনদিক থেকে ছুটো নয়া পয়সা আসবার পথ নেই। বসে বসে অঙ্ক চোষো।

এতবড় সর্বনাশ কী করে হল!

বাড়ি ফিরে বাইরের ঘরেই গুম হয়ে বসে রইল। চাকর চা নিয়ে এসেছিল ফিরিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল রাজেশ্বরী। বেশ খুশী খুশী ভাব—"ওবেলা তো এসেই ছুটলে। খবরটা দেবার ফুরসৎ পেলাম না।"

শুকুল ভয়ে ভয়ে মুখ তুলল। কে জানে এখানে আবার কোন 'সুখবব' অপেক্ষা করে আছে। রাজেশ্বরী সামনেব সোফাটায় বসে বলল, "তোমার অপিসের বড়সায়েব এসেছিল।"

"বড় সাহেব"! প্রায় লাফিয়ে উঠল শুকুল, "কবে? কোথায়?"

"এই তো দিন চাবেক হল। আমরা যেদিন ফিরলাম তার পরদিন সন্ধ্যের একটু পর। রাকেশ ছিল। ঐ এনে বসাল এই ঘরে।"

তারপর? রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল শুকুল। এবার রাকেশ নিজেই এগিয়ে এল। বড় বড় চোখ করে বলল, বিশাল কালে রঙ-এর গাড়ি নিজেই চালিয়ে এসেছেন··· ।

—ধুৎ, গাড়িফাড়ির কথা কে জানতে চাইছে? কী বললে তাই বল।

বললেন, 'মিসেস শুকুল আছেন।' আমি বললাম আছেন।

'আমি তাঁব সঙ্গে একবার দেখা করবো। আমার নাম অরোরা, মিষ্টার শুকুল যেখানে কাজ করেন সেই ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার। উনি আমাকে'—

"শোন কথা!" ভাইয়ের মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিল রাজেশ্বরী, "তুই ম্যানেজার-ফ্যানেজার যাই হোস তাতে আমার কী? আমি তোর সাথে দেখা করতে যাবো কিসের জন্য?"

—তাই বুঝি বলে পাঠালে?

—বলতাম বৈ কি? তা ঐ ছেলেটা যে অন্য কথা বোঝালো। সায়েব-সুবো মানুষ। ওতো জানেনা যে আমবা ওদের মত যাব তার সামনে বেরোই না। চটে যাবে আর ইচ্ছে করলে তোমার 'নকবি' ও নিয়ে নিতে পারে? তাই এলাম।

—অ্যাঁ! এবার রীতিমত আঁৎকে উঠল শুকুল। "তুমি বেরোলে ওঁব সামনে!"

—"কী করবো?" অনেকটা যেন অসহায়ভাবে নবম সুবে বলল রাজেশ্বরী, তোমার 'নকবি' বড় না আমার মন বড়?

—যাক, তাবপব কী হল বল।

—খানিকক্ষণ ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল আমাব দিকে। তাবপর ইঙ্গিবিতে কী যেন বলল বাকেশকে। কী বলল বে?

—বললেন, 'এঁকে নয়, আমি মিসেস শুকুলকে চাইছিলাম।' আমি বললাম, 'ইনিই তো মিসেস শুকুল।' কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি সব পবিচয়-টরিচয় দিলাম। তাবপব গটগট কবে বেবিয়ে গেলেন।

তখনও সরকারী চাকরির জোয়াল কাঁধ থেকে নামেনি। সেটা টানতেই প্রায় সারাদিন কেটে যেত। লেখার অবসর মিলত সন্ধ্যার পর। তার আগে নদীর ধারে বা খোলা মাঠে একটা চক্কর দিয়ে নিতাম। এদিকে পা যেমন চলছে ওদিকে মাথার ভিতরেও একটা চলন-ক্রিয়া শুরু হয়েছে, যাকে তখনই এসে কলমের মুখে ফেলতে না পারলে আর ধরা যাবে না।

সেদিন একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরে সবে টেবিলে গিয়ে বসেছি, দ্বারদেশে গৃহিণীর আবির্ভাব। বুঝলাম, হয়ে গেল! কলমের মুখে যে আসার জন্যে তৈরী হচ্ছিল সে আর এল না। আপাততঃ যিনি এলেন তাঁর মুখ থেকে ছেলেদের অবাধ্যতা, চাকরবাকরের চুরি, জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান দর কিংবা মিসেস অমুকের কোন সদ্য তৈরি নতুন প্যাটার্নের গয়না—এরই একটা কোন লম্বা ফিরিস্তি শোনবার জন্যে গুছিয়ে বসলাম।

কিন্তু উনি সেদিক দিয়ে গেলেন না। বেশ কিছুটা উদ্বেগের সুরে বললেন, নিখিলবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

—না তো।

—এই কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন। তুমি আছ কিনা জিজ্ঞেস করেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন।

—একটু বসতে বললে পারতে।

—বলেছিলাম। কোন সাড়া দিলেন না। কী একটা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেলেন। আগেও তো এসেছেন কবার। বেশ হাসিখুশী। বসেন, গল্প করেন। এরকম তো কখনও দেখিনি। একা থাকেন। বাড়ি থেকে কোন খারাপ খবরটবর এসে থাকবে হয়ত।

নিখিল সেন অ্যাডিশনাল সেসন্স্ জজ। বেশীদিন আসেননি। দেখাও খুব একটা হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। অতি সজ্জন ব্যক্তি। শান্ত, ভদ্র মোলায়েম স্বভাব। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে। বসতে বলার পরেও সাড়া না দিয়ে চলে যাবেন, এরকম তো হবার কথা নয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।

তাছাড়া নিখিলবাবু সন্ধ্যার পর কখনো বেরোন না। লেখেন। অমার মত অসার জিনিস নয়, অনেক বেশী জটিল, দরকারী ও গুরুভার বস্তু। জাজমেণ্ট। কোর্টে সময় পান না। সকালবেলার তাড়াহুড়োর মধ্যেও হয়ে উঠে না। একটি কোলাহলহীন পল্লীর একা ঘরে রাত্রির নিরালা অবসরে নিবিষ্ট হয়ে বসেন। সাধারণ মামলা হলে স্টেনোকে ডিকটেশন দেন। কিন্তু যে সব মামলায় প্রতি পদক্ষেপে ভেবে ভেবে এগোতে হয় এবং এগোতে এগোতে ভাবতে হয় সেখানে নিজের হাতে লেখেন। সময় অনেক বেশী লাগে।

কোর্টেও সহকর্মীদের তুলনায় তিনি অনেক বেশী সময় নেন। সাক্ষীর জবানবন্দি নেবাব পব পুরোটা আবাব তাকে তার নিজের ভাষায় তর্জমা করে পড়ে শোনানো হয়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সব ঠিক আছে কিনা। বেশির ভাগ বিচারক অত হাঙ্গামায় যান না সাক্ষীর বাংলা বয়ান ইংরাজিতে লিখে নিয়ে তার নীচে অম্লান বদনে বসিয়ে দেন—Read out and admitted as correct. পঠিত এবং সত্য বলিয়া স্বীকৃত। আসলে পঠনকার্যটি উহ্যই থেকে যায়, আর 'স্বীকৃতি' স্বরূপ পেশকার হাত বাড়িয়ে হাকিমের ঐ সার্টিফিকেটের নীচে সাক্ষীর একটা সই বা টিপসই গ্রহণ করেন। সে বেচারা জানেও না কী সই করল।

স্বভাবতঃই নিখিল সেনের কোর্টে মামলা চলে ধীর বেগে। উকিলদের অনেকক্ষণ আটক থাকতে হয়। তাঁরা বিরক্ত হন। আইনে তো অনেক কিছু লেখা আছে। সব অক্ষরে অক্ষরে মানতে হলে চলে? আসলে ওটা ওঁর একটা বাতিক। কেউ কেউ—তার

মধ্যে নিখিল বাবুর সহকর্মীও আছেন কিছু কিছু—ঠাট্টা করে বলেন, উনি নিজেকে বড় বেশী conscientious judge বলে মনে করেন। বিবেকবান বিচারক।

কিন্তু লাভ কী হল? Slow অর্থাৎ নিড়বিড়ে বলে ডিষ্ট্রিক্ট জজের কথা শুনতে হয়। বছরে কে কতগুলো মামলার নিষ্পত্তি করতে পেরেছেন তার একটা হিসাব নাকি চেয়ে থাকেন হাইকোর্ট। সে ব্যাপারেও শোনা যায় ওঁর রেকর্ড তেমন ভাল নয়। তবে, ঐ উকিল মহলই আবার বলাবলি করেন কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারি দুরকম মামলাতেই আপীলে ওঁর রায় প্রায়ই বহাল থাকে। ভদ্রলোক সময় কিছুটা বেশী নেন বটে, কিন্তু যা লেখেন তার উপরে হাইকোর্টের বাঘা বাঘা জজেরাও আচড়টি কাটতে পারেন না।

রাত আটটা নাগাদ সেন সাহেবের বাসায় গিয়ে পৌছলাম। তখনও ফেরেননি। চাকরটি, যে ওঁর রান্নাবান্না দেখাশুনো সব কিছু করে উদ্বিগ্ন মুখে দরজার বাইরে সিঁড়ির উপর বসে আছে। জানতে চাইলাম কোথায় যেতে পারেন সাহেব। বলল, মাঝে মাঝে এক আপনার ওখানে ছাড়া কোথায়ও যান না। আপনি একটু বসুন স্যার; হয়ত এখনি এসে পড়বেন।

আমি বসলাম না। আর কিছুটা গেলেই একটা বেশ বড় মাঠ। আমি কখনও কখনও বেড়াতে গেছি সেখানটায়। সন্ধ্যার পর লোকজনের আনাগোনা। শুধু দু-চারজন রেলের প্যাসেঞ্জার তাড়াতাড়ি থাকলে রাস্তা ঘুরে না গিয়ে ঐ পথে সর্টকাট করে। ঐ সময় কোন গাড়িও ছিল না। চারদিক খোলা নির্জন। মাঝখান দিয়ে একটা পায়ে চলার পথ। তাই ধরে কিছুটা এগোতেই দেখি আবছায়া জ্যোৎস্নায় একজন লোক বেশ জোরে জোরে পা ফেলে একবার ডান দিকে যাচ্ছে, আবার বাঁ দিকে ফিরছে। কাছে গিয়েই বুঝলাম, সেন সাহেব। আমাকে দেখে থামলেন। চোখে-মুখে এমন একটা চাঞ্চল্যের ছাপ, যা এর আগে কখনও দেখিনি।

বললেন, ও, আপনি! চলুন, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথ
আছে।

আমি বললাম, বাড়ির সব খবর ভাল তো?

—ভাল। বাসায় যাবেন? তার চেয়ে আসুন না এখানেই বসি।

—বেশ।

আশ্বিনের প্রথম। মাটি শুকনো কিন্তু রুক্ষ নয়। বেশ একট কোমল ঘাসের আস্তরণে ঢাকা। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। তার উপরে মৃদু চাঁদের আলো। পরিবেশটি মনোরম। সেন সাহেবের অবশ্য সেদিকে কোন নজর ছিল না। মুখোমুখি বসবার পরেই প্রথম কথা হল, আজ একটা ডেথ্ সেন্টেস্ দিয়ে এলাম। বলে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন মনে হল। কিন্তু হাসির রেখাগুলো ফুটল না। আমি হালকা সুরেই বললাম, আপনাদের কাছে সে আর এমন নতুন কী? খুনীরা খুন করবে, আপনারা ফাঁসির হুকুম দেবেন আর আমরা ঝুলিয়ে দেব। এটাই বরাবর চলে আসছে এবং চলবে।

সেন সাহেব এসব দিকে গেলেন না। আগের কথার সূত্র ধরে বললেন, এ কেসটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। দুটো রাত ঘুমোতে পারিনি। লোকটা যে গিল্টি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জুরি অবিশ্যি দু ভাগ হয়ে গেছে। তবে মেজরিটি আমার সঙ্গে একমত। কিন্তু অর্ডারটা দেবার পর কেবলই মনে হচ্ছে ভুল করিনি তো? ভেতরে ভেতরে কী রকম একটা অস্থিরতা বোধ করছি। আপনাকে আমি ফ্যাক্ট্গুলো বলতে চাই।

আমাকে বলতে চান। শুনে আমি থ। আমি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্, আইনকানুন কী বুঝি? বিশেষ করে এমন একটা জটিল খুন-মামলার ব্যাপার, ওঁর মত একজন অভিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ বিচারক তা নিয়ে বিচলিত। সেন সাহেব বোধ হয় আমার মনোভাবটা বুঝলেন। বললেন, এ রকম মামলা বড় একটা দেখা যায় না। আইনের কূট প্রশ্ন বিশেষ কিছু নেই। সেগুলো নিয়ে

আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সব ঘটনা জানবার পর একজন চিন্তাশীল মানুষ তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এই লোকটা সম্বন্ধে কী রায় দেবেন? সে খুন করেছে না করেনি? এইটুকুই শুধু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

আমি বললাম, আপনি বলতে চাইছেন, আমি নিশ্চয়ই শুনব, এবং আমার বুদ্ধিতে যা আসে বলব। শুধু একটা কথা। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যা মনে করে, যাকে বলে কমন্‌সেন্স্‌ ভিউ সেটা তো আপনি জুরির কাছেই পাচ্ছেন। যদ্দুর জানি জুরি-ট্রায়ালের উদ্দেশ্যও তাই।

সেন সাহেব হাসলেন, কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, কমনসেন্স্‌ জিনিসটাই যে সব চেয়ে আনকমন। আর জুরির সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। চার্জ বোঝাবার সময়েই ওঁরা বুঝে নেন 'জজ সাহেবের' মতটা কী এবং সেই দিকে ঘাড় কাত করেন। তবু যে মতভেদ হয় তার অনেক কারণ। সে-সব থাক্‌। আপনি শুনুন।

ঘটনাটা ঘটেছিল জিলা শহর থেকে দূরে একটা গ্রামে। বাসিন্দারা প্রায় সবাই গরীব চাষী। সামান্য জমিজমা নির্ভর। চাষবাসের সময় যখন আসে মহাজনের গদি থেকে টাকা ধার করে। ফসল ওঠার ঠিক আগটায় তার লোক আসে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যতটা পারে আদায় করতে। একটা লোকই আসে ফি বছর। তার নাম লছমন সিং। গ্রামের এক কোণে একটা খালি বাড়ি।

মালিকরা থাকে না। তারই বাইরের দিকের ঘরটা ভাড়া নেয়। নিজে রান্নাবান্না করে খায়। লোকটার উপর সবাই অসন্তুষ্ট। একে তো তার কাজটাই অত্যন্ত অপ্রিয়, তার উপরে কথাবার্তা ব্যবহার মোটেই ভাল নয়। টাকা দিতে না পারলে মা-বোন তুলে গালি-গালাজ করে। স্বভাবচরিত্রও খারাপ। মেয়েমানুষ-ঘটিত ব্যাপারেও দু-একবার জড়িয়ে পড়েছিল। টাকার জোরে বেরিয়ে গেছে।

একদিন সকালে উঠে দুজন চাষী যখন মাঠে যাচ্ছে দেখতে পেল লছমন সিংয়ের লাশ পড়ে আছে তার বাসার সামনে রাস্তার উপর। ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ এল। যথারীতি 'জোর তদন্ত' শুরু হল। শাঁসালো পার্টি। সুতরাং ব্যাপারটা শুধু থানার হাতে রইল না। জিলার কর্তারাও তৎপর হয়ে উঠলেন।

বাড়িটার এক দিকে খোলা মাঠ, লোকবসতি নেই, আরেক দিকে খান তিনেক বাড়ি, তাও খানিকটা ছাড়া ছাড়া। সেইগুলোতেই বিশেষ মনোযোগ দিল পুলিশ। সকলেব এক কথা—আমরা কিচ্ছু জানি না।

চিৎকার-টিৎকারও শুনতে পাওনি?

আজ্ঞে না।

ঠিক পাশে যে বাড়িটা, তার দূরত্ব প্রায় শ-খানেক হাত। দুখানা খুপরি মত ঘর। পিছনের ঘরে থাকে দুটি বিধবা, মা ও মেয়ে, খুব গরিব, আর সামনের ঘরে থাকে একটি চোদ্দ-পনর বছরের ছেলে, ওদের কী রকম আত্মীয়। তার নাম আবদুল। মাইলখানেক দূরে একটা মাদ্রাসা আছে। সেখানে পড়ে। খাওয়া-থাকার খরচ বাবদ ঐ বিধবাদের কিছু টাকা দেয় তার অভিভাবকেরা।

পুলিশ দেখে মেয়েমানুষ দুটি তো কান্না জুড়ে দিল। ছেলেটাও প্রথমে বলেছিল সে কিছু জানে না, ঘুমিয়ে ছিল তার ঘরে। সকালে লোকজনের গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখে ঐ কাণ্ড। কিন্তু তার হাবভাব দেখে আই. ও অর্থাৎ তদন্তকারী অফিসারের সন্দেহ হয়। থানায় নিয়ে নরম-গরম দু'রকম পদ্ধতি চালাবার পর সে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে সে দেখেছে। যে খুন করেছে তাকেও সে চেনে। যে গাঁয়ে তার মাদ্রাসা সেখানে বাড়ি। একটু গুণ্ডা গোছের লোক, সবাই ভয় করে চলে। নামও বলে দিল—ইয়াকুব। সঙ্গে আরও তিনজন ছিল। তাদের সে চেনে না। ইয়াকুবকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিল পুলিশ। আর কোন সাক্ষী পাওয়া যায় কিনা

তার জন্যে ব্যাপক চেষ্টা চালাল বেশ কিছুদিন। পাওয়া গেল না।

থানায় যা বলেছিল, নিম্ন আদালতে তারই পুনরুক্তি করল আবদুল। তারই উপর নির্ভর করে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ইয়াকুবকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। যথাসময়ে মামলা উঠল সেন সাহেবের এজলাশে।

আবদুলের জবানবন্দির মূল কথা হল—ঐদিন রাত্রে তার জ্বর এসেছিল। ঘুম আসছিল না। মাঝে মাঝে উঠে মেঝেতে রাখা মাটির কলসী থেকে জল খাচ্ছিল। তখন কত রাত সে জানে না। গেলাসের বাড়তি জলটা ফেলতে গিয়েছিল, মাটির দেয়ালের গায়ে একটা জানলা মত ছিল, তার ভিতর দিয়ে।

হঠাৎ নজর পড়ল সিং যে ঘরটায় থাকে তার সামনের বারান্দার নীচে একটা লোক চিং হয়ে পড়ে আছে, মুখে কাপড় গোঁজা। দুজন লোক দুটো পা চেপে ধরেছে আর একজন ধরেছে মাথার দিকটা, আর ঐ ইয়াকুব (কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীকে সনাক্ত করল) দায়ের মত কী একটা দিয়ে লোকটার গলা কাটছিল। তখম আকাশে চাঁদ ছিল এবং ঐ জায়গায় তার আলো এসে পড়েছিল। ইয়াকুবের মুখ ছিল এ বাড়ির দিকে, আবদুল যেখানে থাকে, আর দু-তিনবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল। তাতেই চিনতে পেরেছিল তাকে। তারপরেই ঘরে এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে ছিল। ভীষণ ভয় করছিল তার। যদি ওরা তাকে দেখে ফেলে থাকে অমনি করে তাকেও হয়তো কেটে ফেলবে। সারা রাত ঘুমোতে পারেনি, বিছানা ছেড়েও ওঠেনি।

আসামী পক্ষের বক্তব্য—সবটাই মিথ্যা এবং শেখানো বুলি। ঐ বয়সী একটা ছেলের পক্ষে অত রাত্রে জেগে থাকা, জানলায় গিয়ে খালি খালি উঁকি মারা একেবারে অসম্ভব। জ্বরটা নিছক তৈরি। জল খাওয়া বা জানলা দিয়ে সেটা ফেলতে যাওয়া স্রেফ বানানো। তার উপরে সব চেয়ে যেটা আসল কথা,—ঐ রাত্রে সামান্য চাঁদের আলোয় অতদূর থেকে যে বর্ণনা দিয়েছে চর্মচক্ষে তার কিছুই দেখা সম্ভব নয়। লোক চিনতে পারার তো প্রশ্নই ওঠে না।

জ্বর সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে মাদ্রাসার বৃদ্ধ মৌলবীকে সাক্ষী মানা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, জ্বর আসাতে আবদুল ঐদিন সকাল সকাল ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল। বাড়ির মেয়েছেলে দুটির সাক্ষ্যেও তার সমর্থন ছিল। কলসীতে জল রাখার কথাও তারা স্বীকার করেছিল। তাদের অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখতে পাননি কোর্ট।

এসব গেল গৌণ বিষয়। আসল ব্যাপার হল ঐ চাক্ষুষ প্রমাণ। তার সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জজ সাহেব স্বয়ং উভয় পক্ষের উকিল সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছিলেন। যে পক্ষের যে তিথিতে এবং পোস্টমরটেম রিপোর্ট অনুযায়ী যে সময়ে খুনটা হয়েছিল, ঠিক তখনই তিনি গিয়েছিলেন। আবদুলের ঘর জানলা, সেখান থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। আবদুলকে মেডিক্যাল কলেজ আই ইনফার্মারিতে পাঠিয়ে তার চোখ পরীক্ষার রিপোর্ট'ও আনিয়ে নিয়েছিলেন।

আবদুলের জবানবন্দি যখন নেওয়া হয় তার বয়ানই শুধু রেকর্ড করেননি; তার বলবার ধরন, প্রশ্নের উত্তরে তার প্রতিক্রিয়া, হাবভাব, চোখমুখের অবস্থা, ওঁরা যাকে বলেন 'ডিমীনার', সব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছিলেন।

বার-এর একজন প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র অ্যাডভোকেট আবদুলকে দুদিন ধরে প্রচণ্ড জেরা করেছিলেন। ছোটখাটো ব্যাপারে দু-একটি সামান্য গরমিল (যা না থাকলেই বরং সন্দেহ হ'ত পারে সাক্ষীকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করা হয়েছে) ছাড়া ছেলেটির সাক্ষ্যে কোন অসঙ্গতি বের করতে পারেননি।

আবদুল সরকার পক্ষের একক সাক্ষী। আসামীর বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রমাণ নেই। আসামী দোষী না নির্দোষ নির্ভর করছে ঐ চোদ্দ-পনর বছরের একটি ছেলের সাক্ষের উপর। আইনের দিক থেকে তাতে কোন বাধা নেই। একজন সাক্ষীই যথেষ্ট যদি তার উক্তি নির্ভরযোগ্য হয়, তাকে নিঃসংশয়ে এবং সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়।

এক্ষেত্রে ঐ বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপরেই মূল প্রশ্নটা দাঁড়িয়ে আছে। বিচারকের মনে যদি প্রত্যয় জন্মে থাকে আবদুল যা বলেছে সব সত্য, তার কোন অংশ তার বা অন্য কারও রচনা নয় তাঁর সিদ্ধান্ত হবে—অ্যাকিউজ্‌ড্‌ ইজ গিলটি—আসামী দোষী। আর যদি তার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ দেখা দিয়ে থাকে, আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আর কোন কারণ থাক আর না থাক ঐ সন্দেহের সুযোগ (বেনিফিট অব ডাউট) দিয়ে তাকে মুক্তি দিতে হবে।

নিখিল সেন তাঁর সামনে উপস্থাপিত উভয় পক্ষের সমস্ত তথ্য বক্তব্য যুক্তি তর্ক সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখলেন। তিনি নিজে যে সব উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, যা দেখেছেন, বুঝেছেন সেগুলোও সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করলেন। আবদুলকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। বয়স? সেটা বরং তার স্বপক্ষেই যাচ্ছে। অতএব তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে হল—আসামী অপরাধী, যে খুনের অভিযোগে তার বিচার চলছে সেটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত।

জুরির অধিকাংশ মেম্বার তাঁদের 'গিলটি' অভিমত আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে একটা আবেদন আছে—আসামীকে যেন চরম দণ্ড না দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর হাত বাঁধা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা প্রমাণিত হলে তার দণ্ড মৃত্যু। অবশ্য লঘুতর দণ্ড দেওয়া যায় যেমন যাবজ্জীবন কারাবাস, যদি অপরাধের পিছনে তেমন কোন লঘুকারক কারণ থাকে, ওঁদের ভাষায় extenuating factors—আকস্মিক প্রবল উত্তেজনা, তীব্র প্ররোচনা, আক্রমণ, সম্মানের উপর গভীর আঘাত, অল্প বয়স বা ঐ ধরনের অন্য কিছু। এক্ষেত্রে তার সবটারই অভাব। একটা নিরস্ত্র অসহায় লোককে চারজন মিলে খুন করেছে। স্থির মস্তিষ্কে। লোকটা অত্যাচারী বা দুশ্চরিত্র হতে পারে। কিন্তু তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ঘটাবার মত প্রমাণ আসামী পক্ষ দেখাতে পারেনি।

সুতরাং ফাঁসির আদেশ দিতে হল। নিখিল সেন তাঁর দীর্ঘ রায়ের শেষে সে আদেশ শান্ত অবিচল কণ্ঠে ঘোষণা করলেন।

তারপরেই কেমন একটা চাঞ্চল্য অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। ভুল হল না তো? একটি মাত্র অর্বাচীন সাক্ষী, আর কোন প্রমাণ নেই। 'কিন্তু আইনেতে। সেটা কোন বাধা নয়।' 'তাহলেও।' 'সাক্ষীকে অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই।' 'তবু।' 'বেনিফিট অব্ ডাউট কি দেওয়া চলত না?' 'কেমন করে? ডাউটের স্কোপ কোথায়?' 'একটা লোক দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছে।' 'উপায় কী?' সেও তো একটা লোককে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অপরাধেব সঙ্গে সমতা রেখেই তো দণ্ড দিতে হবে।' 'তা ঠিক, কিন্তু—'

কিছু মামুলী কাজ ছিল। সইটই-এর ব্যাপার। পেশকার কাগজপত্র পেশ করেছিল। কিন্তু সেন সাহেবের মনের মধ্যে তখন তুমুল দ্বন্দ্ব চলছে। কোন কিছুই যেন মাথায় ঢুকতে চাইল না। উঠে পড়লেন, বাসায় এসে কোর্টের পোশাক ছেড়েই ছুটলেন আমার খোঁজে। না পেয়ে, মাঠে। যে ওঁকে বুঝবে, ওঁর সমমর্মী এমন কারও কাছে নিজেকে মুক্ত করে না দেওয়া পর্যন্ত শান্ত হতে পারছিলেন না

—আচ্ছা আপনার কী মনে হয় মিস্টার চৌধুরী?

মামলার বিবরণ শেষ হতেই আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ সাগ্রহ দৃষ্টি ফেললেন সেন সাহেব, আপনি হলে কী করতেন?

আমি মনে মনে হাসলাম। যেন কত বড় একজন জজ আমি, কত মামলা করেছি! কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। আসল কথা ওর মন তখন একটা কিছু আঁকড়ে ধরার জন্য ব্যাকুল। দৃঢ় গম্ভীর স্বরে বললাম, ফাঁসির হুকুম দিতাম।

—ঠিক?

—নিশ্চয়ই। তাছাড়া এ কেস-এ আর কী জাজমেণ্ট্ হতে পারে?

নিখিলবাবু কিছুটা আশ্বস্ত হলেন মনে হল। কিন্তু বোঝাটা যেন পুরোপুরি নামল না।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করতে হলে সেটা সাত-দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে। এই নিয়ম।

পরদিন কনডেম্‌ড্‌ সেল্‌-এ (যেখানে ফাঁসির আসামীদের রাখা হয়) গিয়ে সন্থ দণ্ডিত কয়েদীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপীল করবে?

লোকটা অসহায় ভাবে বলল, কিন্তু আমার তো টাকাপয়সা নেই হুজুর।

বোঝা গেল এতদিন যারা ওর খরচপত্র চালাচ্ছিল তারা আর উৎসাহী নয়। হয়ত মনে করছে সে মরতে চলেছে, তার পিছনে খরচপত্র করা নিছক অর্থদণ্ড। আমি বললাম, ইচ্ছা করলে জেল থেকে আপীল করতে পার। তাতে কোন খরচ নেই।

সেই ব্যবস্থাই হল। কয়েদীদের আপীল, দরখাস্ত ও চিঠিপত্রাদি লিখিবার জন্যে কিছু লেখাপড়া জানা কয়েদী আছে। তাদের বলা হয় কন্‌ভিক্‌ট্‌ রাইটার বা কয়েদী-লেখক (লেখক কয়েদী নয়)। তাদের বিদ্যা অতি সামান্য, আইন-কানুনের জ্ঞান নেই। তারা যা লেখে তার মধ্যে কোন আইনগত প্রশ্ন বা নিম্ন আদালতের যুক্তি-খণ্ডনের চেষ্টা—ওসব কিছুই থাকে না। একটা বাঁধা গৎ আছে—হুজুর, অধীন সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। সাক্ষীরা আক্রোশবশতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। অতএব মহামান্য জজ বাহাদুরের নিকট কাতর প্রার্থনা—অধীনকে বেকসুর খালাস দিতে আজ্ঞা হয়।

ইয়াকুবের তরফ থেকে এই রকমের একটা আপীলই পাঠানো হল। তার সঙ্গে রইল দণ্ডদাতা বিচারকের রায়। এবং অন্যান্য নথিপত্র। আমার অফিস থেকে দরখাস্ত করে সে-সব আগেই আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

খুন-মামলার আপীলের ফল আসতে খুব একটা দেরি হয় না। বিশেষতঃ আপীলকারী যেখানে ফাঁসির দড়ির দিকে তাকিয়ে দিন গুনছে। এটা যেন আরও তাড়াতাড়ি এল।

দেড়টা আন্দাজ, সবে অফিস থেকে ফিরছি, জেলারবাবুর টেলিফোন—এই মাত্তর ইয়াকুবের খবর এসে গেল স্যার। বেকসুর খালাস।

হাইকোর্টের রায় পরে আসবে। অর্ডারটা লাল খামে (সেইটাই নিয়ম) কবে জরুরী ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেন সাহেব তখন কোর্টে। ফোন কবলাম। এজলাসে ফোন থাকে না। অফিসে গিয়ে ধরতে হয়। যে কেরানীটি ধবল, খবর দিতে চায় না। বলল, উনি কেস করছেন !

—বলুন, খুব জরুরী। জেলা-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কথা বলবেন।

খবরটা দিতেই মহা উল্লাসে উচ্চ কণ্ঠে সাড়া দিলেন জজসাহেব, কী বললেন ! ছেড়ে দিয়েছে ? উঃ, বাঁচালেন মশাই। জানেন, কত রাত ঘুমোতে পারিনি !

জেলারবাবু এলেন বিকেলবেলা। বললেন, নেহাৎ কপালগুণে বেঁচে গেল লোকটা।

—কী রকম ?

—খুন ওই করেছে।

—আপনি কী করে জানলেন ?

—যাবার সময় বলে গেল। প্রথমে জমাদারকে বলেছিল, আমি বিশ্বাস করিনি। তারপর আমার সামনেও সোজা কবুল করল, আমিই কেটেছি শালাকে। আরও তিনজন ছিল। তারা চেপে ধরেছিল।

—ওটা হয়ত বাহাদুরি দেখাবার জন্যে বলেছে।

—না' স্যর। তাহলে কি আর আমি বুঝতাম না ? এতকাল এত কয়েদী ঘাঁটলাম !

একবার মনে হয়েছিল সেন সাহেবকে জানিয়ে দিই। তারপর ভেবে দেখলাম, থাক্। তিনি বিচার ভুল করেছেন, হাইকোর্ট তাঁর সুচিন্তিত রায় বাতিল করে দিয়েছে একথা শুনেও যদি একজন কৃতী

অভিজ্ঞ বিচারক স্বস্তি পেয়ে থাকেন, তিনি ভুল করেননি, এ খবর দিয়ে আর সেটা নষ্ট করি কেন ?

ছবি

মুরারিপুকুর থেকে ফিরেই ভুবন একেবারে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। এর আগে যতবার গেছে, বেশ হাসিমুখ করে ফিরেছে। ওখানে কে কেমন আছে, তাই নিয়ে মায়ের সঙ্গে দু-চারটা কথাবার্তা বলে, তারপর ঘরে ঢুকেছে জামা ছাড়তে। আজকের এই তফাতটা সৌদামিনীর নজর এড়াল না। মনে মনে হাসলেন। টুলির সঙ্গে খুনসুড়ি-টুরি হয়ে থাকবে হয়তো। ঐ মেয়েটার উপরেই যে ছেলের মন পড়ে আছে, সে কথা তিনি জানেন। সেই জন্যেই ফি মাসে দু একবার 'বরদা কাকার ওখান থেকে ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ে। ওরই মধ্যে একটু সাজগোজ করে বেরোয়। বরদা কুণ্ডু ওঁদের আত্মীয় নয়, লতায় পাতায় জড়ানো একটা সম্পর্ক আছে, এই পর্যন্ত।

ছেলে বেরোচ্ছে না দেখে সৌদামিনী দরজার সামনে গিয়ে ডাকলেন, কী হল ! এসেই শুয়ে পড়লি যে ? শরীর খারাপ করেনি তো ?

—না।

—ওরা সব কেমন আছে ?

—ভালো।

—উঠে আয়। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নে। রাত কম হয়নি; নটা বেজে গেছে।

—আমি খাবো না।

—কেন ?

—খিদে নেই।

সৌদামিনী মনে করলেন ওরা নিশ্চয়ই মোটা রকম জলখাবার খাইয়ে দিয়েছে। উদেব নজর আছে ভুবনের দিকে। আগেকার দিন হলে অবশ্য ববদা কুণ্ডু তাদের ঘবে মেয়ে দিতে তিনবার ইতস্ততঃ করত। এখন আব সে কথা ওঠে না। জমি-জমা কাজ-কবাবাব সবই তো ওপারে ফেলে আসতে হয়েছে। তাছাড়া ছোলও তাঁর ফেলনা নয়। মোটর ড্রাইভারী শিখে একশ পঁচিশ টাকা মাইনের চাকবি পেয়েছে। সবকাবী লোন নিয়ে মাথা গুঁজবার জায়গাও একটু করে নিয়েছে, তা বলতে গেলে, শহরের মধ্যেই। মেয়েটাকে যে সৌদামিনীব খুব পছন্দ, তা নয়। একটু যেন বেশী বেশী ফরফব করে। কিন্তু কী কবা যায। ছেলের যখন মনে লেগেছে তাঁব নিজের পছন্দ বা অপছন্দব কথা ওঠে না। তাছাড়া আজকাল সব মেয়েই ঐ রকম। তাঁদেব কাল কি আর আছে ? পায়ের দিকে ছাড়া চাইবে না, সাত চড়ে রা করবে না—সে জাতের মেয়ে এখন পাবেন কোথায় ?

সৌদামিনী ঘরে ঢুকে ছেলেব ছেড়ে ফেলা সার্ট, প্যাণ্ট আলনায় গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'খিদে নেই বলে একেবারে না খেয়ে থাকবি ? দুখানা রুটি মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে, তার পব শো।'

ভুবন জবাব দিল না। দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে পাশবালিশটাকে জড়িয়ে বেশ গোছগাছ করে শুল।

সৌদামিনী আব কথা বাড়ালেন না।

আসলে, ভুবনেব তখন রীতিমত পেট জ্বলছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী জ্বলছে বুকের ভিতরটা। টুলির সেই কথাগুলো ঘুরে ফিরে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধছে। সেই বিশেষ খবরটা শোনবার জন্যেই যেন তৈরী হয়ে বসে ছিল—"জানো! নরেশদার ছবি বেরিয়েছে কাগজে। দেখবে ?" উত্তরের অপেক্ষা করেনি। উপচে পড়া খুশীর জোয়ারে ছুটে গিয়ে ও ঘর থেকে নিয়ে এসেছিল একটা

বাঁধানো খাতা ; তার প্রথম পাতায় কত যত্ন করে লাগানো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা থেকে কেটে নেওয়া একখানা ছবি—কোন্ এক 'মিতালি নাট্যসঙ্ঘের' 'শেষরক্ষা' অভিনয়ের একটি দৃশ্য। তিনজন অভিনেতা। তার মধ্যে কোনটা যে নরেশ, ভুবন প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। টুলিই দেখিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। গর্বভরে বলল, এই ছ্যাখ, কী সুন্দর উঠেছে ছবিটা! তাই না?

—'সখের থিয়েটারের ছবি!' বেশ খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ভুবন, 'আমি মনে করেছিলাম কী যেন।'

—'হলই বা সখের থিয়েটার? খবরের কাগজে ছবি বেরোন কি সোজা কথা নাকি! কজনের বেরোয়!'

'আরো দেখবে?'

পরের পাতায় ঐ মিতালি-সঙ্ঘেরই আর একটা কি অনুষ্ঠানের গ্রুফ ফটো। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে নরেশ। 'নরেশদা বলেছে, আরো অনেক ছবি বেরোবে। বেরোলেই কাটিং এনে দেবে আমাকে।'—মাথা নেড়ে নেড়ে এই কথাগুলো যখন বলছিল টুলি, তার মুখের রেখা, চোখের দীপ্তি এবং কণ্ঠের সুরে যে ভাবটি ফুটে উঠেছিল তার মাত্র একটি অর্থই করা যায়—খবরের কাগজে ছবি মুদ্রণের মধ্যে যে গৌরব, সেটা শুধু নরেশের নয়, তার এই সপ্তদশী ভক্তটিও তার সঙ্গে সম-গরবিনী।

নরেশ যদি ঐ সময়ে ওখানে উপস্থিত থাকত, ভুবন কি করে বসত, বলা শক্ত। আপাততঃ যতটা সম্ভব বাক্য দ্বারা তাকে নস্যাৎ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। সেই ভাবেই বলল, 'হুঁঃ, ভারি তো দুটো ছবি! ও রকম আকছার বেরোচ্ছে আজকাল। ইচ্ছে করলে সবাই দু-চারখানা ছাপাতে পারে।'

—'পারে নাকি!' চোখে ও কপালে বিদ্রূপের কুঞ্চন তুলে হাসি হাসি মুখে বলেছিল টুলি, 'বেশ তো, চেষ্টা করে ছাখ না একবার?' বলেই আর দাঁড়ায়নি। খাতাটা বন্ধ করে দুহাতে বুকের উপর তুলে নিয়ে যৌবনোচ্ছল দেহে তরঙ্গের দোলা দিয়ে চলে গিয়েছিল

অন্য ঘরে। ভুবনের মনে হয়েছিব, যাবার সময় যেন এক তাল অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়ে গেল তার মুখের উপর।

সকালে উঠে চা খেয়ে ভুবন কাজে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মুরারিপুকুর দেশপ্রাণ কলোনীর' একখানি ছোট ঘরের একটি বিশেষ দৃশ্য তখনো তার মনের মধ্যে চেপে বসে আছে। ঐ নরেশ তার চিরদিনের 'তুশমন'; 'শত্রু' বললে যেন সবটুকু বলা হয় না। ছেলেবেলা বেলা থেকে ওর কাছে সে শুধু হেরেই এসেছে। এক গ্রামের ছেলে, একই ক্লাসে পড়ত। কিন্তু ভুবন পালের চেয়ে নরেশ সরকার সব পরীক্ষাতেই বেশ কয়েক ধাপ উপরে। শব্দরূপের 'সাপের মন্তর' আগাগোড়া নির্ভুল আউড়ে দিত, ভুবন কিছুতেই পেরে উঠত না, উল্টো পাল্টা হয়ে যেত। ফলে পণ্ডিত মশায়ের কাছে নরেশের পাওনা ছিল পিঠ চাপড়ানি, আর ওপর কপালে জুটত কানমলা। পুরস্কার বিতরণী সভায় নরেশ সব চেয়ে ভালো আবৃত্তি করে প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরত। ভুবনেব কাজ ছিল চেয়ার বেঞ্চি টানা, সামিয়ানা খাটানো, আর 'প্রাইজ' বলতে হেডমাস্টার মশাই-এর মুখ ভেংচি।

এই টুলির সঙ্গে ভুবনের ভাব কি আজকেব? এ-পাড়া ও-পাড়া বাড়ি। কত বয়স তখন ওদের? নয় আর তেরো। অতটুকু মেয়ের ফাই ফরমাস খেটে খেটে প্রাণান্ত। তালের ডোঙ্গায় চেপে ঝিনাইদ' বিলের মাঝখান থেকে শাপলা ফুল তুলে আনতে হবে। কালী বাড়ির পেয়াবা গাছের মগডালে চড়ে সব চেয়ে বড় পেয়ারাটা পাড়তে হবে, আর সারা গায়ে কাঁটার খোঁচা খেয়ে পাকা পাকা বেতফল সংগ্রহ করতে হবে বাড়ুয্যেদের ভুতুড়ে ভিটের বেত ঝোপের ভিতর থেকে। নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নতুন ধামির মধ্যে ঝেঁকে ঝেঁকে টুলিই সেগুলো জারাত এবং বড় ভাগটাই তুলে দিত তার হাতে। আপত্তি করলে বলত, 'নাও না? এত কষ্ট করে পেড়ে আনলে।' মাঝে মাঝে ওর ঠাকুরমার লুকোনো হাঁড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে আসত কুলের আচার। কী মিষ্টি খেতে। কিন্তু তার

চেয়েও মিষ্টি লাগত ওকে।

একদিন ঠাকুর মশাইদের বুড়ো বটগাছের তলায় সেই ফোকরটার মধ্যে গায়ে গায়ে বসে ওরা কুলের আচার খাচ্ছিল। কদিন আগে ধুমধাম করে বাড়ুয্যে বাড়ির বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সেই সব দৃশ্য বোধহয় দুজনারং চোখের উপর ভাসছিল। খেতে খেতে ভুবন হঠাৎ বলে উঠল, 'তোতে আমাতে বিয়ে হবে, কেমন টুলি?'

ওর গায়ে একটা ঠেলা মেরে টুলি বলল' 'যাঃ!'

—'যাঃ কেন?'

—'বা-রে, লজ্জা করে না বুঝি?'

বরের পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়ানো শেফালিদির সেই ঘোমটা ঘেরা লজ্জা-রঙিন আনত মুখখানাই বোধহয় ওর মনের মধ্যে আনা-গোনা করছিল।

সেদিনটা কি কারণে ছুটি ছিল। সকালের দিকে টুলিদের বাড়ি গিয়ে দেখে, সে ভীষণ ব্যস্ত। সামনে একখানা খোলা বই, আর হাতের কাছে একটা কাঁসার বাটির মধ্যে কতগুলো টুকরা টুকরা কাগজ ভিজছে। ও সেই দিকে গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভুবন জিজ্ঞাসা করল, ওগুলো কিরে?

—'জলছবি।'

—'কোথায় পেলি?'

—'নরেশদা দিয়েছে। এই এং-তো'—দুখানা হাত অনেকটা ফাঁক করে দেখাল টুলি, 'ওর ছোটমামা আছে কোলকাতায়। সে নিয়ে এসেছে। ত্তাখ না কী, সুন্দর!'

ভুবনের এ সব ভালো লাগল না। জলছবি না ছাই! তার যদি অমনি একটা ছোটমামা থাকত—কোলকাতার কলেজে পড়া—সে এর চেয়ে অনেক ভালো ভালো জিনিস এনে টুলিকে তাক লাগিয়ে দিতে পারত। আপাততঃ যখন সে সম্ভাবনা নেই,

যে প্ল্যান নিয়ে এসেছিল, সেইটাই বেশ লোভনীয় করে তুলে ধরল। বোসেদের খিড়কির পুকুরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে ছিপ দিয়ে পুঁটি মাছ ধরা। ওদের গোয়াল ঘরের চাল থেকে একখানা বোলতার চাকও ভেঙে এনেছিল। কাপড়ের আড়াল থেকে তুলে দেখাল। হাতে দুজায়গায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে বোলতাগুলো, তাও জানিয়ে দিল ঐ সঙ্গে। এই মাছ ধরার ব্যাপারে টুলির ভীষন উৎসাহ। রূপোর মত চকচকে চওড়া চওড়া পুঁটিগুলো যখন ছিপের টানে ছটফট করতে করতে জল থেকে উঠে আসে, তাব খুশী আর ধরে না। মাছগুলো সে-ই খুলে নিয়ে খালুইতে রেখে দেয়। টোপ গেঁথে দেয় বশার ডগায়।

আজ সে সব কিছু যেন কানেই তুলল না। বোলতার কামড়ে ভুবনের হাতটা বেশ ফুলে উঠেছিল। সেদিকেও একবার ফিরে তাকাল না আরেকবার তাড়া দিতেই পাকা গিন্নীর মত বলল, 'বাপরে! আমার কি এখন মরবার ফুরসত আছে? এই এতগুলো ছবি তুলতে হবে, দেখছ না? পারলে হয়। ছিঁড়ে টিঁড়ে গেলে নরেশদা এসে বকবে।'

ভুবন বিরস মুখে উঠে চলে গেল। রাস্তায় পড়ে বোলতার চাকখানা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলল। আর একবার হার হল নরেশের কাছে।

মনিব লোহার কারবার করেন। রোজ সকালে তাকে ভবানীপুর থেকে মানিকতলার কারখানায় পৌছে দিতে হয়। আজ সমস্ত পথটা ভুবন সেই ছেলেবেলাকার পুরনো দিনের মধ্যেই ডুবে রইল। মনে মনে সংকল্প করল, এবার সে কিছুতেই হার মানবে না। টুলিকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ। তার বাবার কাছে গিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে হয়তো তিনি বিমুখ করবেন না। কিন্তু সে পাওয়ায় সুখ নেই। ওরই কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে।

দেখাতে হবে, ঐ থিয়েটার-ওয়ালা নরেশের চাইতে সে কোন অংশে ছোট নয়। টুলি সেদিন তাকে প্রকারান্তে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দিয়েছে। সে চ্যালেঞ্জ সে গ্রহণ করল। কাগজে ছবি বেরোনই যদি কৃতিত্বের মাপকাটি হয়, ভুবন দেখিয়ে দেবে সেখানেও সে পিছনে পড়ে নেই।

একখানা নাম করা কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে একটি কর্মীর সঙ্গে ভুবনের পরিচয় ছিল। পাড়ার এক ফটোগ্রাফারের স্টুডিও থেকে ছবি তুলিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করল। সে জানতে চাইল, উপলক্ষটা কী। খালি খালি তো আর কারো ছবি ছাপা যায় না। ভুবন বোঝাল, 'উপলক্ষ কিছু নয়। তোমরা যেমন টাকা নিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপ, তেমনি ছবি ছাপবে। নিচে লেখা থাকবে—প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী বৃন্দাবন চন্দ্র সাহা এণ্ড কোম্পানীর সুযোগ্য মোটর ড্রাইভার শ্রীভুবন মোহন পাল। খরচ পত্তব যা লাগে, দেবো।'

বন্ধুটি হেসেই অস্থির। বলল, 'না ভাই, এখানে ও সব চলবে না। অন্য কোনো ছোটখাট কাগজ ছাখ।'

তাই করল ভুবন। অপেক্ষাকৃত কম-নামী কাগজের দ্বারস্থ হল। কেউ রাজী হল না। সকলের এককথা—ছবি ছাপাতে হলে একটা কিছু করা চাই। একজন ওকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করে প্রস্তাব করল, 'এক কাজ করুন, 'হারান—প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ' কলামে একটা বিজ্ঞাপন দিন। তার সঙ্গে ছবি চলতে পাবে।'

—'সেটা কী জিনিস?' জানতে চাইল ভুবন।

—'আপনার নাম কি?'

—'ভুবন মোহন পাল।'

—লিখুন,—'ভুবন পাল নামক বাইশ-তেইশ বৎসরের একটি যুবক বাড়ি হইতে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ সন্ধান দিতে পারিলে নগদ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই সঙ্গে তাহার ফটো দেওয়া হইল। চার্জ পড়বে—'

চার্জ শুনবার জন্যে ভুবন আর অপেক্ষা করল না।

তাহলে এবারেও কি তাকে হার মানতে হবে—সেই চিরশত্রু নরেশ সরকারের কাছে? টুলির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে নীরবে হটে আসতে হবে? মাঝে মাঝে মনে হয়, ওর এই বদখেয়ালের কাছে নতিস্বীকার করতে হবে, এই বা কেমন কথা? কাগজে যাদের ছবি বেরোয় না, তারা কি মানুষ নয়? কিন্তু এ যুক্তি বেশীক্ষণ টেঁকে না। সেই গর্বোৎফুল্ল চোখদুটি মনে পড়ে—কী একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফটোগুলোর দিকে! এব পরে নিজের একটা ছবির কাটিং না নিয়ে তার কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে কেমন করে?

সৌদামিনী লক্ষ্য করছিলেন, কিছুদিন থেকে ছেলে যেন সব সময়েই মন-মরা হয়ে থাকে। হাসে না, কথাবার্তা বলে না, পেট ভরে খায় না। দুটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে বাসায়, ওঁর বিধবা বড় মেয়ের ছেলেমেয়ে। আগে তাদের নিয়ে হৈ চৈ করত, এখন ফিরেও দেখে না।

একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতেই ধরলেন ছেলেকে—'তোর কী হয়েছে, বল তো?'

—'কী হবে?'

—'কুণ্ডু মশাইদের বাসায় গিয়েছিলি এর মধ্যে?'

—'না।'

—'তাহলে কালই একবার ঘুরে আয়। অনেকদিন খোঁজ খবর নেই।'

—'তারাও তো একবারে খবর নিতে আসে না।'

—'কী যে বলিস! ওখানে খবর নেবার মত আছে কে? ঐ বুড়ো মানুষ আসবে নাকি এতটা পথ ট্যাং ট্যাং করতে করতে!'

আর বলতে হল না। পরদিন বিকালেই বেরিয়ে পড়ল ভুবন। একটা নতুন আশা জাগল মনে—এতদিনে নিশ্চয়ই সেই ছবির ভূতটা

ওর মাথা থেকে নেমে গেছে। মেয়েমানুষের ঝোঁক তো। বাঁধভাঙা বন্যার মত। যেমন বেগে আসে, চলেও যায় তেমনি তাড়াতাড়ি।

মুরারিপুকুরে পৌঁছে মনে হল, না এলেই বোধহয় ছিল ভালো। এবার শুধু ছবি নয়, যার ছবি সে-ই সশরীরে আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। সামনে টেবিলের উপর আরেকখানা কাটিং। বোঝা গেল, ঐ নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা চলছিল। কুণ্ডুমশাই এবং তার স্ত্রীও উপস্থিত। দুজনেই খুব তারিফ করলেন—ছবির এবং 'ছবিওয়ালার'। তাদের কন্যাটির মুখ দেখে মনে হল, 'নরেশদার' গর্বে এবার বোধহয় ফেটে পড়বে। নরেশ এ-কথা ও-কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, ছবি-টবি উঠল নাকি কোনোখানে?' অর্থাৎ তার প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। হয়তো সেদিন যা সে বলেছিল, তাই নিয়েই দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা হাসাহাসিও হয়ে গেছে।

নরেশ একটু পরেই উঠে পড়েছিল। ভুবন আরো কিছুক্ষণ বসে যাবে এইটাই ওরা আশা করেছিলেন। কুণ্ডু দম্পতি সেটা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সে আর বসতে পারেনি। একটিবার টুলির সেই হাসিহাসি মুখখানার দিকে চেয়ে আজকের হারটা যেন আরো তীব্র ভাবে লেগেছিল তার বুকে।

বৃন্দাবনবাবুর বাড়ি যে রাস্তায়, তারই মোড়ের কাছে একজন উপমন্ত্রী থাকেন। তাঁর ড্রাইভার প্রায়ই আসত ভুবনের কাছে এবং একটানা দুঃখের কাহিনী বলে যেত—মন্ত্রীদের ড্রাইভারী করবার মত ঝকমারি কিছু নেই; শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদল—বারোমাস মফঃস্বল। আজ মাকড়দ, কাল আরামবাগ, পরশু মেমারী। শুধু শহর বন্দরে হলেও কথা ছিল না। দূর দূর গ্রামে চলে যেতে হয়। ফিরতে কখনো বেলা দুটো, কখনো রাত বারটা। আর সে

কি রাস্তা! কোনদিন যে কোন পগারে পড়ে বেঘোরে প্রাণটা যাবে, মা কালীই জানেন।

সেদিনও এই সব কথা হচ্ছিল। ভুবন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, তোমার মনিবের তো দেখি হরদম ছবি বেরোয় কাগজে।

—'তা বেরোবে না?' বিরক্তি প্রকাশ করল ড্রাইভার, 'মিটিংএ বক্তৃতা করতে উঠলেন তো দুদিক থেকে তেড়ে এল ক্যামেরা। যত সব।'

—'তুমি কেন ছবি তোলাও না ঐ সঙ্গে?'

—'আমি? দূর, ছবি দিয়ে কী হবে? আর তাছাড়া আমার ছবি ওরা তুলবেই বা কেন?'

—'তবু যদি বল একবার মন্ত্রী মশাইকে?'

—'ক্ষেপেছ?'

ভুবনের উপর তার মনিব খুশী ছিলেন না। ইদানীং যে সে গাড়ি চালাতে চালাতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, সেটা তাঁর লক্ষ্য এড়ায়নি। কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছেন। একদিন তো অ্যাকসিডেন্ট্ হতে হতে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিল গাড়িটা। সুতরাং সে গিয়ে যখন চাকরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করল, সাহা মশাই বিশেষ আপত্তি করলেন না। ওকেই একজন ভালো লোক যোগাড় করে দিতে বললেন। লোক তো হাতের মধ্যেই ছিল। মন্ত্রীর ড্রাইভারকে বলতেই সে রাজী হয়ে গেল। ভুবনের শর্ত ছিল মন্ত্রীর কাজটি তাকে পাইয়ে দেওয়া। সেদিকেও কোনো অসুবিধা হল না। তিনিও এই অনিচ্ছুক লোকটাকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভুবনের আগ্রহ দেখে এবং যথারীতি টেষ্ট্ ইত্যাদির পর খুশী হয়ে তাকেই নিয়ে নিলেন। বৃন্দাবনবাবুরও মন্ত্রীর ড্রাইভারটিকে পছন্দ হল।

মন্ত্রীর সঙ্গে মফঃস্বলে গিয়ে ভুবন প্রায়ই দেখে ক্যামেরাম্যানদের জীপ আগেই পৌঁছে গেছে। কিন্তু ছবি তোলবার সুযোগ হয় না।

ফটো তো বাইরে নেওয়া হয় না, হয় প্যাণ্ডেল বা হল-এর মধ্যে, মন্ত্রী যখন বক্তৃতা করতে ওঠেন। সেখানে গণ্যমান্যরাই তাঁকে ঘিরে থাকে। ভুবনের মত লোকেদের প্রবেশাধিকার নেই।

একদিন হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। বক্তৃতার শেষে চা পার্টির আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। তারপরে একটা গ্রুপ ফটো নেবারও ব্যবস্থা আছে। ভুবন তাকে তাকে আছে, ঠিক সময়ে লাইনে গিয়ে মিশে যাবে। অনেক লোকই সেই সুবিধা খুঁজছিল। এক ফাঁকে সেও তাদের দলে ভিড়ে গেল। একটু পাশের দিকে পড়ে গেল। তা আর কি করা যায়! ফটোগ্রাফাররা এসে ক্যামেরা ফিট করল। কালো ঘেরা টোপের মধ্যে বার দুই আসা যাওয়া করল। তারপর 'রেডি'? বলে খুলে ধরল মুখের খাপটা। ভুবনের মনে হল, এতবড় সাফল্য তার জীবনে আর আসেনি।

সন্ধ্যার মুখে বাড়ি ফিরেই ছুটে গেল মুরারি পুকুর। মন্ত্রীর গাড়ি চালায়, এ খবর আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। এবার নিয়ে গেল আসল খবর। টুলি অন্য কি সব বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। তার মাঝখানেই ভুবন বেশ খানিকটা গর্বের সঙ্গে বলে ফেলল, 'কাল কিংবা পরশু দিনের দৈনিক কাগজগুলো একবার দেখো।'

—'কেন? কী আছে তার মধ্যে?'

—'বিশেষ কিছু না। এমনিই একবার দেখো।'

—'ছবি বেরোচ্ছে নাকি তোমার?' সাগ্রহে জানতে চাইল টুলি! ভুবন তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'কী করব? মন্ত্রীর টি-পার্টি। লোকগুলো শুনল না। জোর করে ধরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ক্যামেরার সামনে।'

টুলির মুখখানা খুশীতে ঝলমল করে উঠল। বলল, 'কোন কাগজে বেরোবে?'

—'যুগান্তর, আনন্দবাজার এই সব বড় বড় কাগজে থাকবে নিশ্চয়ই।'

কিন্তু টি-পার্টি'র ছবি যখন বেরোল কাগজখানা হাতে করে বসে পড়ল ভুবন। মন্ত্রীর ডাইনে বাঁয়ে জন কয়েক করে লোক রেখে বাকী সব কাটা! টুলির কাছে তাকে আরেকবার অপদস্থ করবার জন্যেই যেন একযোগে ষড়যন্ত্র করেছে কাগজওয়ালারা!

তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ভুবন এবারে ঠিক করল, তার মনিব যখন বক্তৃতা মঞ্চে মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, তখন কোনো ফাঁকে তাঁর কাছে চলে যেতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা সহজ নয়। ভলান্টিয়ারের দল অত্যন্ত সজাগ। সর্বদা পথ আগলে থাকে। একদিন দেখল, মন্ত্রী তাঁর এটাচি কেসটা গাড়িতে রেখে গেছেন। সেটা হাতে করে মঞ্চের পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। পরদার ফাঁক দিয়ে যেমনি দেখল, ফটোগ্রাফার এগিয়ে আসছে, ভয়ানক ব্যস্তভাবে ভলান্টিয়ারদের কাছে গিয়ে বলল, এটা উনি ভুল করে গাড়িতে ফেলে গেছেন, হয়তো কোনো দরকারি কাগজ-পত্তর আছে।

মন্ত্রী বক্তৃতা করতে উঠেছিলেন। হঠাৎ সেখানে ড্রাইভারকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন। ভুবন চামড়ার ব্যাগটা এগিয়ে ধরতেই ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এটা তোমাকে কে আনতে বললে এখানে? যাও। যেখানে ছিল রেখে দাও গে।'

ফটোগ্রাফার বাধা পেয়ে আগেই হাত নামিয়ে নিয়েছিল।

সেদিন ভাগ্যে যে আরো দুর্দশা লেখা ছিল, সেটা তখনো বুঝতে পারেনি ভুবন। বুঝল, গাড়িতে ফিরে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল প্লাটফরমের পিছনে। সেই ফাঁকে হেডলাইট দুটো উধাও হয়ে গেছে এবং চাকার পাশে যে ঢাকনি লাগানো থাকে তারও চারখানার মধ্যে তিনখানা নেই। তাকিয়েই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অন্ধকার রাত। অনেকখানি পথ। তার মধ্যে বেশ কিছুটা খানাখন্দ ভরা গ্রামের রাস্তা।

মন্ত্রী এসে সব দেখলেন এবং শুনলেন, কিন্তু ড্রাইভারকে কিছুই

বললেন না। সভার উদ্যোক্তারা কোত্থেকে একটা মাত্র হেডলাইট নিয়ে এসে লাগিয়ে দিল। একচক্ষু বাহনটিকে অতি সাবধানে চালিয়ে বাড়ি ফিরতেই মন্ত্রীমশাই প্রথম মুখ খুললেন। গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, কাল থেকে তোমাকে আর দরকার নেই। এ কদিনের মাইনেটা ওমাসের পয়লা তারিখে এসে নিয়ে যেও।

ভুবনকে এবার বেশ কিছুদিন বাইরে বেরোতে দেখা গেল না। কিন্তু ঘরে বসে থাকলে সংসার শুনবে কেন? ছোট বড় মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটি পেট। ঐ একজনের উপর নির্ভর, অথচ চাকরি তো চাইলেই পাওয়া যায় না। ড্রাইভার বন্ধুরা কেউ কেউ পরামর্শ দিল, 'ট্যাকসি মালিকদের ধর। খাটতে পারলে রোজগারও ভালো।'

ভুবনের মনে মনে এই লাইনের উপর বরাবর একটা বিতৃষ্ণা ছিল। 'ট্যাকসি-ওয়ালা' কথাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা অবজ্ঞার গন্ধ জড়ানো আছে। যেখানে সেখানে যার তার হাতের ইংগিতে থেমে যাওয়া—সেও যেন মানুষের সাধারণ মর্যাদার বাধে। বাড়ির গাড়ি যে চালায়, তার মনিব একজন বা একটা পরিবার, আর ট্যাকসি চালকের মনিব রাম শ্যাম যদু মধু সকলেই। এমন কি চৌরঙ্গীর মোড়ে ছেঁড়া পাজামা-পরা ভিখারী ছেলেগুলো যখন প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে বখশিশের আশায় 'এই, ট্যাকসি' বলে হাঁক দেয়, তার মধ্যেও যেন একটা হুকুমের সুর বেজে ওঠে।

তবু ভুবনকে শেষ পর্যন্ত ট্যাকসির চাকরিই নিতে হল।

সেদিনটা বোধ হয় চৈত্র সন্ধ্যা। এলোমেলো উতলা বাতাস। হাওড়া স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ভুবন চলেছিল বালিগঞ্জের দিকে। একটি সুবেশ তরুণের পাশে সুরূপা তরুণী। সম্ভবতঃ সন্তবিবাহিত। একটা ধার ঘেঁষে ঘন হয়ে বসেছিল তারা। ভুবন পিছন ফিরে তাকায়নি। তবু মাঝে মাঝে ভেসে আসা দুটো একটা

টুকরো কথা, একটুখানি চাপা হাসি, চুড়ির ঠুনঠুন, শাসন-ভরা মৃদুকণ্ঠ, তার সঙ্গে জুঁই-এর কড়া গন্ধ (সম্ভবতঃ মেয়েটির খোঁপায় জড়ানো মালা থেকে) সব মিলিয়ে তাকে যেন কোন মায়ালোকে নিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, পিছনের আসনে যারা বসে আছে, তারা যে দুটি অপরিচিত নরনারী, একথা সত্য নয়, তাদের একজন সে নিজে, আরেকটি তার অনেক দিনের চেনা।

ওদের পৌঁছে দিয়ে ভবানীপুরে মালিকের গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল পেছনের সীটে হেলান দিয়ে রাখা একটা মাঝারি সাইজের স্যুটকেস। লাগেজ ক্যারিয়ারে যে মাল ছিল, সেসব দেখে শুনে নামিয়ে নিতে ত্রুটি হয়নি। ভুলে গিয়েছিল শুধু নিজেদের চোখের সামনে সাবধানে রাখা আসল জিনিসটি। এমনিই হয়। ভুবনের দৃঢ় বিশ্বাস হল, ওর মধ্যে গয়না আছে। সংগে সংগে তার মনের কোণে জেগে উঠল লোভের কালো ছায়া—এই উঞ্ছবৃত্তির গ্লানি থেকে মুক্তির আশ্বাস নিয়ে এসেছে ঐ বাকসটা। পরক্ষণেই চোখের উপর ভেসে উঠল মেয়েটির সেই ক্ষণিকের দেখা মুখখানা। তখনই উঠে পড়ল গাড়িতে।

বাড়িটা মনে ছিল। সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই দরজা খুলে গেল এবং হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল একদল উদ্বেগ-চঞ্চল মেয়ে-পুরুষ। সেই তরুণটি এগিয়ে এসেছিল। ভুবন দরজা খুলে স্যুটকেসটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরতেই, সকলে সমস্বরে আনন্দ—কলরব করে উঠল। ভিড়ের একপাশে মেয়েটিও এসে দাঁড়িয়েছিল। ভুবনের হঠাৎ মনে হল, সে নয়, হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে টুলি।

বাড়ির কর্তা—সম্ভবতঃ বধূটির শ্বশুর—দুখানা দশটাকার নোট তুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি যে উপকার করলে টাকা দিয়ে তার দাম দেওয়া যায় না। ছেলেপিলেদের জন্যে এই সামান্য—'

'মাপ করবেন' হাত জোড় করে বলল ভুবন, 'আপনারা খুশী হয়েছেন, সেইটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

"ও কখনো টাকা নেয়? দেখেছ না বাঙালী ভদ্দরলোকের ছেলে" —বলতে বলতে একটি বর্ষীয়সী মহিলা, বোধহয় বাড়ির গৃহিণী, সামনে এগিয়ে এলেন। অনুনয়ের সুরে বললেন, "একবারটি ভিতরে আসতে হবে, বাবা। একটুখানি মিষ্টিমুখ না করে গেলে, আমাদের মন মানছে না।"

এ অনুরোধ ভুবন এড়াতে পারল না।

জলযোগের পর সেই ছেলেটি এসে বলল, 'আপনার একটা ছবি নেবো।'

ভুবন কিছু বলবার আগেই কর্তা ওধার থেকে যোগ করলেন, 'ছবিটা আর তার সঙ্গে একটা রিপোর্ট কালই যুগান্তর অফিসে পাঠিয়ে দিস।—বাবুকে আমার নাম করে বলিস যেন পরশুকার কাগজেই বেরোয়।'

ভুবন হঠাৎ এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কোনো কথাই বলতে পারল না। তবে কি এতদিন পরে তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সত্যিই সফল হতে চলেছে? আজ কার মুখ দেখে ভোর হয়েছিল!

যখন তারা বিদায় দিলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ফাঁকা রাস্তা, তার উপরে মন যে স্তরে বিচরণ করছিল, গাড়ির বেগ কোথায় উঠল, একেবারেই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সামনে পড়ল একটা ভিখারী বুড়ী' যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে দাঁড়াল একেবারে বাম্পারের গা ঘেঁষে। দুর্দম বেগের মুখে সহসা পাশ কাটাতে গিয়ে তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল এঞ্জিনটা। তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল ভুবন জানে না।

লোকজন এসে দেখল, একটা ল্যাম্প পোষ্টের গায়ে আছড়ে পড়ে

গাড়ির সামনেটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। স্টিয়ারিং হুইলের ডাণ্ডাটা সোজা বিঁধে গেছে ড্রাইভারের বুকে।

অতবড় অ্যাকসিডেণ্ট! বিস্তারিত বর্ণনার পাশে ভাঙা গাড়ি এবং নিহত ড্রাইভারের ছবিটাও পরের দিনের সবগুলো বড় বড় কাগজে ছাপা হল। কাঁচের টুকরো লেগে মুখটা দু-তিন জায়গায় কেটে গিয়েছিল তাহলেও টুলি নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে।

একটি হাঙ্গার স্ট্রাইকের নেপথ্য কাহিনী

অফিস থেকে বেরিয়েছি। তখনই সে ঢুকল। কালো ঘেরাটোপঢাকা কয়েদী-গাড়ি থেকে নেমে এসে দাঁড়াল সেণ্ট্রাল জেলের আউটার আর ইনার গেটের মাঝখানে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, প্রশস্ত বুক, ঈষৎ সোনালী রং-এর কোঁকড়ানো চুল নেমে এসেছে কাঁধের উপর। তার উপরে বিশাল পাগড়ি। আধময়লা জোব্বার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল দেহশ্রী। নামটাও জমকালো। সৈয়দ আফজল খাঁ। পাঠান না আফগান ঠিক জানি না। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কোনো প্রান্তে তার দেশ। কৌতূহল হল। ওয়ারেণ্ট চেয়ে নিয়ে দেখলাম, ৩৯৬ আই, পি, সি। ডাকাতির সঙ্গে নরহত্যা। শুনলাম, তিনচারটা মারাত্মক মারাত্মক মামলার সঙ্গে সে জড়িত। তাই কোর্টে যাওয়া আসার পথে প্রিজন্‌ভ্যানের মধ্যেও তার হাতে পড়ত হাতকড়া। একদিন এই নিয়ে লেগে গেল পুলিশের সঙ্গে। হাবিলদার বলল, 'হাতকড়া খুলে দিলে কোন্ দিন তুমি লাফিয়ে পড়ে ছুট্ দাও, কে জানে?'

'—যদি দিই, আটকাতে পারবে?' বলে এক দুই তিন ঝট্‌কায় ভেঙে ফেলল হাতকড়া লাফিয়েও পড়ল না, ছুটও দিল না। শুধু দেখিয়ে দিল, সে সবই পারে। তারপর থেকে কোর্টের

পথে তার ডাইনে বাঁয়ে লেগে থাকত তুজন করে রাইফেলধারী গুর্খা।

যেমন বিশাল বপু, তেমনি বিপুল ছিল তার দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার। কিন্তু আফজল খাঁর দীর্ঘ হাজতবাসের মধ্যে ওদিকটা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হয়নি। শহরের প্রান্তে ওদের মস্ত বড় ঘাঁটি। সেখান থেকে ওর বন্ধুরা নিয়মিত যোগান দিত ডেকচি-ভর্তি খাসী বা ভেড়ার মাংস, মোটা মোটা চাপাটি আর সেই সঙ্গে আঙুর-আনার-কাজু-মনাক্কার প্যাকেট। বিচারাধীন আসামীর বাইরে থেকে খাদ্য-প্রাপ্তি আইনসিদ্ধ। জেল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অধিকার চলে যায়। তখন সে পুরোপুরি জেলের পোষ্য। সুতরাং সাত বছর মেয়াদ নিয়ে যেদিন কোর্ট থেকে ফিরে এল আফজল খাঁ, উভয় দিকেই সমস্যা দেখা দিল। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী-খাদ্য তিন প্রকার—বেঙ্গল ডায়েট (তুবেলা ভাত) বিহার ডায়েট (একবেলা ভাত, একবেলা রুটি) আর পাঞ্জাব ডায়েট (তুবেলাই রুটি)। প্রথামত ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ ডায়েট নেবে তুমি?'

আফজল খাঁ গম্ভীরভাবে বলল, 'আফগান ডায়েট।'

ডাক্তারের কোডে এ হেন বস্তুর উল্লেখ নেই। সুতরাং বিকল্প ব্যবস্থা হ'ল—পাঞ্জাব ডায়েট্। ডাক্তারের বোধহয় মনে হয়েছিল, এই পেশোয়ারী পাহাড়টিকে আর যেখানেই হোক্ অন্নভোজী এলাকায় ফেলা যায় না। আফজল নালিশ জানাতে এল আমার কাছে। সোজাসুজি মন্তব্য করল, 'আপ্‌কা জেহ্‌লমে ইন্‌সাব্ নেহি হ্যয়।'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কন, কি অবিচারটা দেখলে তুমি?'

—আপ্‌কা বেঙ্গল ডায়েট্ হ্যয়, বিহার ডায়েট হ্যয়, পাঞ্জাব ডায়েট্‌ভি হ্যয় আফগান, ডায়েট্ কেঁও নেই হোগা?

সঙ্গত প্রশ্ন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আফগান ডায়েট্ কি পদার্থ, খাঁ সাহেব?'

"লিখ্ লিজিয়ে," বলে একটা দৈনিক খাদ্য তালিকার ফিরিস্তি দিয়ে গেল আফজল খাঁ। "সেরভর দুম্বারা গোশ্‌ত্" বিকল্পে খাসীর মাংস থেকে শুরু করে আটা মাখন দুধ মশলা পেস্তা বাদাম ফলমূল এবং সকলের শেষে এক প্যাকেট সিগারেট যোগ করে যখন থামল, হিসাব কষে দেখলাম, তার দাম কম করে ধরলেও ছ'টাকা বারো আনা। একজন সাধারণ কয়েদীর রোজকার বরাদ্দ শুধু বারো আনা কিংবা তাব চেয়েও কম। সুতরাং আফজল খাঁর দাবি পূরণ যে আমাদের শক্তির বাইরে একথা স্পষ্ট করেই জানাতে হল। সেও ঠিক তেমনি স্পষ্ট করেই জানিয়ে গেল যে এ ছাড়া এবং এর চেয়ে কম কোনো খাদ্য সে গ্রহণ করবে না।

শুরু হ'ল হাঙ্গার স্ট্রাইক।

সেদিন হ'ল বৃহস্পতিবার। আমার হাসপাতাল পরিক্রমার পালা। অন্য সব ওয়ার্ড থেকে দূরে এক কোণের আফজল খাঁর ছোট ঘরটিতে গিয়ে দেখলাম, তার নাসিকা ভোজনের আয়োজন চলছে। একটা বেশ বড় বালতি ভরা দুধ। ডিম, কমলালেবু ইত্যাদির পরিমাণও রীতিমত রাজসিক। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাঙ্গার স্ট্রাইকের রুগী আপনার ক'জন?'

—আজ্ঞে, একজন, বলে ড'ক্তার একটু হাসলেন। কৌতূহল হল। দাঁড়িয়ে গেলাম খানিকক্ষণ। 'ফিড্' শুরু হ'ল। একটা বড় জগে করে ফানেলের মধ্যে মিশ্র রসায়ন ঢালা হচ্ছে, আর দুটো নল বেয়ে সেটা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে উন্নত নাসারন্ধ্রে। এক একটা জগ শেষ হয়, আর চেঁচিয়ে ওঠে আফজল 'আউর দেও।' জগ ভরতে যেটুকু দেরি, তার মধ্যে আবার হুঙ্কার দেয়, 'আউর দেও।' এমনি করে গোটা বালতিটা নিঃশেষ হয়ে গেল।

আফজল খাঁর অনশন যে একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। আমার অফিসারদের মতে, যে লোক সারাজীবন ধরে শুধু মণ মণ মাংস চিবিয়ে এসেছে, সে

নাক দিয়ে দুধ গিলে কতদিন থাকবে। পেটের খিদে না হয় মিটল, দাঁতের ক্ষিধে মেটাবে কি দিয়ে? কিন্তু দেখলাম, আমরা ভুল করেছি। মাস কেটে গেল। আস্তে আস্তে শয্যার সঙ্গে মিশে গেল সেই বিশাল দেহ; কিন্তু মন রইল অটল। পুরোপুরি আফগান ডায়েট না হলেও, স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, তার কাছাকাছি কোনো খাদ্য-তালিকা মঞ্জুর করা অসম্ভব হবে না, এ রকম একটা আভাস তাকে দেওয়া হয়েছিল। কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

একদিন কী একটা প্রয়োজনে বিকালে একবার যেতে হয়েছিল জেলখানায়। হাসপাতালে যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অফজল খাঁকে দেখে যাবার ইচ্ছা হল। একটা কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছে তার ছোট ঘরটিতে। সেই মৃদু আলোয় তার রক্তহীন মাংসবিরল দীর্ঘ দেহটার দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম। হঠাৎ মনে হ'ল সে বেঁচে নেই, পড়ে আছে শুধু একটা চর্মাবৃত কঙ্কাল। ধীরে ধীরে খাটের পাশে যে চেয়ারখানা ছিল তার উপরে গিয়ে বসলাম। একবার শুধু সে তার নিষ্প্রভ চোখদুটি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল। তারপর পড়ে রইল তেমনি নিস্পন্দ নিথর মৃতদেহের মত। মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, 'খাঁ সায়েব!'

—সাব্!

—এমনি করে জান দিয়ে কী লাভ?

—এ জান রেখেই বা লাভ কি, ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল আফজল।

চমকে উঠলাম। তবে কি এই আত্মহত্যার পিছনে আর কোনো নিগূঢ় কারণ আছে? আফগান ডায়েটটা শুধু অভিনয়? বললাম, 'এ কথা কেন বলছ? সাতটা বছর কতটুকু সময়? দেখতে দেখতে চলে যাবে। জোয়ান বয়স তোমার। নতুন করে ঘর বাঁধবে। গোটা জীবনটাই তো সামনে পড়ে আছে।'

ক্ষীণ আলোকে মনে হল তার বিবর্ণ ওষ্ঠের কোণে যেন জেগে

উঠল একটু খানি মৃদু হাসির আভাস। তেমনি ধীরে ধীরে বলল, 'ঘর আমার ভেঙে গেছে সা'ব।'

—তোমার বাপ মা আছে?

—যখন দেশ ছেড়েছি, তখন ছিল। তারপর কি হয়েছে, জানি না।

—জেনানা?

—না সায়েব। সাদি হয়নি আমার।

—যাকে চেয়েছিল, তাকে পাওনি বুঝি?

আফজল খাঁ এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। শোনা গেল মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাসের ক্ষীণ শব্দ। তারপর উদাস কণ্ঠে বলল 'সে সব ব্যাপার চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে। আজ নতুন করে সে কথা তুলে কোনো লাভ নাই।'

বললাম, 'সংসারে কিছুই কোনোদিন চুকে যায় না, আফজল খাঁ। ভাঙা-গড়াই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। যাক্ রাত হ'ল, এবার আমি উঠি।'

আফজল খাঁ শীর্ণ হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করল। আর কোনো কথা বলল না।

দিন তিনেক পরে সন্ধ্যাবেলা আমার বাংলো-সংলগ্ন বাগানে একটা বাঁধানো চত্বরের উপর বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষণ-সিক্ত গাছপালার উপর সন্ধ্যার করুণ ম্লানিমা। সেদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, চারদিকে যা কিছু দেখছি সব যেন কোনো প্রচ্ছন্ন বেদনার অদৃশ্য সূত্র দিয়ে গাঁথা।

টেলিফোন বেজে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার। আফজল খাঁ আমার দর্শন-প্রার্থী? 'আজই' হ্যাঁ, এখনই।'

সেই ছোট্ট ঘরখানায় স্তিমিত আলোয় বসে অনেকক্ষণ ধরে শুনে গেলাম আফজল খাঁর ক্ষীণ কণ্ঠের গুঞ্জরণ। বিশেষ কোনো ভূমিকা দিয়ে শুরু হয়নি তার কথা। আমার অনুচরদের যখন ঘর

ে:ক সরিয়ে দিলাম সে বলল 'আপ্ জেহলকা বড়া সাহেব, ম্যয় আপ্ কা কয়েদী—

বাধা দিয়ে বললাম, 'আজকার সন্ধ্যাটা অনন্ত সে ব্যবধান নাদের না-ই বা রইল খাঁ সাহেব।'

এর পরেই আর কিছু না বলে সে সোজা চলে গেল তার কাহিনীতে।

সৈয়দ বংশের ছেলে। ঘরে খাবার-পরবার অভাব নেই। আফজল ছেলেবেলা থেকেই একটু খেয়ালী এবং বেপরোয়া। রূপ এবং স্বাস্থ্য—এর কোনোটাতেই খোদা তার বেলায় কার্পণ্য করেননি। তাছাড়া তার রাইফেলের নিশানা ছিল নির্ভুল এবং শিকারের নেশা দুর্নিবার। রুক্ষ, কঙ্করময় তাদের দেশ। কোথাও নেই একবিন্দু শ্যামলিমা। তবু অদ্ভুত মায়া ছিল তার সেই দেশের উপর। বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে তার ভারি ভাল লাগত। এমনি এক উদ্দেশ্যবিহীন পথচলার ফাঁকে খেজুর বনের ছায়ায় তার সঙ্গে দেখা। মাথায় জলের ঘড়া। ফিরছিল দূরের কোন ঝরনা থেকে। আওরত; কিন্তু রক্ত-মাংসের নয়। বাস্রাই গোলাপের কোমল পাপড়ি দিয়ে তৈরি তার দেহ। আর মুখখানা? আফজলের মনে হ'ল, সেটাও ঠিক মুখ নয়, একটি সদ্য-স্ফুট শিশির-ধোয়া রক্ত গোলাপ। প্রথম দিন কোনো কথা হয়নি। হয়েছিল শুধু ক্ষণিকের দৃষ্টি বিনিময়। চোখের ভিতর থেকে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিয়ে ঘাঘরা দুলিয়ে সে উঠে গেল চড়াই পথ বেয়ে। আফজলও ফিরে এল। কিন্তু সে শুধু তার দেহ। তার সবটুকু দিল্ সে রেখে এল ঐ ঢালু পাহাড়ের বাঁকে।

তারপর আবার দেখা হ'ল। তারপর আবার; এবং তারপরে বার'বার। পরিচয় হ'ল। আস্তে আস্তে হ'ল প্রাণ দেয়া নেয়া। আসমানী—(নামটা আমার দেওয়া নয়, বাবু সাব্, বলেছিল আফজল, ওর বাপ মা-ই রেখে গিয়েছিল। তা না হলে ঐ নামেই

ডাকতাম আমি। সে তো দুনিয়ার নয়, আসমানের)—আসমানী কুমারী নয়, এক বৃদ্ধ রুগ্ন সর্দারের বিবি। সমস্ত দিন তার সেবা করে তার রূঢ় গঞ্জনা সয়ে সয়ে হাঁপিয়ে উঠেছিল একটু আলোর জন্যে, একটু হাওয়ার জন্যে। খোদা মেহেরবান্। তার জীবনের সেই আলো আর হাওয়া নিয়ে এল আফজল। ওর প্রশস্ত বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কোমল কণ্ঠে বীণার মৃদুতান তুলে এই ভাষায় সে কথা বলত। ঊষর উদাস মাঠের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে শুনে যেত আফজল, শুধু কান দিয়ে নয়, সমস্ত অন্তর দিয়ে।

একদিন কি খেয়াল হ'ল আফজলের। বলে উঠল, 'চল, তোমার সর্দারকে দেখবো।'

—'কেন, সর্দারনীকে দেখে বুঝি আশ মিটছে না?' চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল আসমানী।

—'এইটুকুতে কি আশ মেটে আসমান?' গাঢ়স্বরে বলল আফজল;—'সবটুকু না পেলে দিল্ ভরে না, শুধু হাহাকার করে বুকের ভেতরটা।'

কাছে টেনে নিয়ে আসমানীর মাথাটা সে চেপে ধরল বুকের উপর, যার ভিতরে তোলপাড় করছে তাজা রক্তের ঢেউ। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুষ্ক স্বরে বলল আসমানী, 'কিন্তু আমার যে হাত-পা বাঁধা আফজল। এর বেশী তো আমার দেবার কিছু নেই।'

টস্‌টস্ করে মুক্তাধারার মত ঝড়ে পড়ল চোখের জল। আতর মাখা রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিল আফজল। হাত বুলিয়ে দিল আনার ফুলের মত কোমল পেলব দুটি রক্তাভ গণ্ডে।

একদিন সত্যিসত্যিই সর্দারকে দেখতে গেল আফজল। বারান্দায় খাটিয়ার উপর পড়ে আছে একটা বিপুল মাংসপিণ্ড। যেমন কুৎসিত, তেমনি অসভ্য লোকটা। ওকে দেখেই রুখে উঠল, 'কে তুমি? কি চাই?' তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে

তাকিয়ে বলল, 'ও' তুমিই আমার সুন্দরী বিবির রোসনাই দেখে মেতে উঠেছ। সুবিধা হবে না, মিঞা সাহেব। একদিন স্রেফ পুড়ে মরবে তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। বেঘোরে প্রাণটা দিয়ে লাভ কি?

আফজলের কানে এর একটা কথাও যায়নি। সে দাঁড়িয়েছিল আচ্ছন্নের মত। এরই সঙ্গে ঘর করে আসমানী! ঐ কদাকার দেহটার পরিচর্যা করবার জন্যেই কি খোদা তাকে আসমান থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন?

ফিরবার পথে আসমানীর সঙ্গে দেখা। কি একটা বলতে গেল আফজল। কিন্তু গলায় তার স্বর ফুটল না। আসমানীর মুখে ম্লান হাসি। বলল, 'দেখলে আমার ঘর?'

—এ ঘর ভেঙে তোমায় বেরিয়ে আসতে হবে, আসমানী। চল, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। চলে যাই কোনো দূর দেশে। কেউ জানবে না, কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না।

—তোমায় তো বলেছি আফজল, সে উপায় আমার নেই। ঐ বুড়ো যদ্দিন বেঁচে থাকবে, এখান থেকে আমার নড়বার পথ বন্ধ।

—কেন?

—আমার বাবা যে আমাকে দেনার দায়ে বাঁধা দিয়ে গেছে ঐ সুদখোর লোকটার কাছে। যতদিন ও ছেড়ে না দেয় ওর সংসারে থেকেই সে ধার আমাকেই শুধতে হবে।

এ সমস্যার হঠাৎ কোনো সমাধান আফজলের চোখে পড়ল না। কিন্তু তার বুকের মধ্যে বিঁধে রইল আসমানীর সেই অসহায় করুণ মুখখানা, সমস্ত চেতনার মধ্যে জেগে রইল শুধু একটি কথা—যেমন করে হোক আসমানীকে বাঁচাতে হবে।

কিছুদিন কেটে গেল। পর পর ক'দিন নির্দিষ্ট গোপন স্থানে আসমানীর দেখা পাওয়া গেল না। দুশ্চিন্তা হ'ল আফজলের।

অসুখ-বিসুখ করেনি তো ? পরদিন আবার গিয়ে উঠল সেই সর্দারের বাড়ি। আসমানীর কোনো সাড়া নেই। ওকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল বুড়ো সরদার, 'আবার এসেছিস, শয়তান ?'

—'কেন মুখ খারাপ করছ খালি খালি ?' ঝাঁঝিয়ে উঠল আফজল,—আসমানী কোথায় ?

—'ওঃ বড্ড দরদ দেখছি', বিকৃত কণ্ঠে বলল সর্দার। তারপর গর্জে উঠল, 'আসমানী কোথায় তা জেনে তোর কি হবে রে, কুত্তা ?'

—'খবরদার ! গাল দিও না বলছি', রুখে উঠল আফজল।

—'তবে রে হারামীকা বাচ্চা !'

খাটিয়ার পাশে ছিল নাগরা। তারই একপাটি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল আফজলের দিকে। জুতোটা সজোরে গিয়ে লাগল ঠিক তার মুখের উপর। আফগান রক্ত টগবগ করে উঠল। এক মুহূর্ত কি ভাবল আফজল খাঁ। তারপর ছুটে গেল বাইরে। দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল তার গুলি-ভরা রাইফেল। তুলে নিয়েই টেনে দিল ট্রিগার। অব্যর্থ সন্ধান।

হঠাৎ কিছুক্ষণ সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল আফজল। তারপর দেখল, খাটিয়ার উপর পড়ে আছে সর্দারের রক্তাক্ত অসাড় দেহ। তার উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে আসমানী। তার বুকের বসন ভিজিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে রক্তের ধারা। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখের তারা থেকে ঠিকরে পড়ল অগ্নিশিখা। তীরের মত ছুটে এল তীক্ষ্ণ স্বর—'নির্লজ্জ, কাপুরুষ। মনে করেছ আমার স্বামীকে খুন করলেই আমি তোমার হাতে ধরা দেব। এই ছিল তোমার মতলব, না ?'

শান্ত অনুনয়ের সুরে বলল আফজল, 'বিশ্বাস কর আসমানী। কোনো মতলব নিয়ে আমি আসিনি। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে চাই। কিন্তু তার জন্যে তোমার স্বামীকে খুন করবো ! না-না। শুধু অপমান সইতে না পেরে রাগের মাথায়--'

—'বেরিয়ে যাও,' ক্রুদ্ধা নাগিনীর মত গর্জে উঠল আসমানী, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। খুনী, ডাকু, শয়তান…

সেইদিনই কাউকে কিছু না বলে দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানের পথে বেরিয়ে পড়ল আফজল খাঁ।

আফজল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ দম নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আসল কথা কি জানো, সাহেব, নিজের মনটাকেই বুঝতে পারেনি আসমানী। ঐ বুড়ো জানোয়ারটাকে সে যে কতখানি ভালোবেসেছিল সেটা প্রথম জানতে পারল তখন, যখন তার বুকের পাশ দিয়ে বিঁধে গেছে আমার রাইফেলের গুলি।'

শহরের উপকণ্ঠে ওদের যে-দলটা ছিল, জেল হবার পরেও তারা মাঝে মাঝে দেখা করতে আসত আফজল খাঁর সঙ্গে। ইদানীং আর আসেনি। হয়তো তারা উঠে গেছে অন্য কোথাও। কিংবা হয়তো দেখা করবার প্রয়োজন আর নেই। আফজল খাঁর ঘরে সেই সন্ধ্যাটি যেদিন কাটিয়ে এলাম তার ক'দিন পরেই একজন দর্শন-প্রার্থী এসে উপস্থিত। হাঙ্গার স্ট্রাইক যারা করে বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নিষিদ্ধ। সুতরাং মোলাকাতের আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য হবার কথা। তবু লোকটাকে ডেকে পাঠালাম। চেহারা এবং পোষাক দেখে মনে হল সে পাঠান। বলল, আফজল ওর ছেলেবেলার দোস্ত্, দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে কিছু, পাশাপাশি গ্রামে বাড়ি। জেলের মধ্যে না খেয়ে আছে, এই খবর পেয়ে দেশ থেকে ছুটে এসেছে ওকে একবার দেখবার জন্যে। এবার হুজুর অর্থাৎ আমি যদি দয়া করে—তার বক্তৃতা শেষ হবার আগেই তার চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'আসমানীকে চেনো?'

লোকটার মুখে পড়ল বিস্ময়ের ছায়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, চিনি। কিন্তু হুজুর তাকে—'

—কোথায় আছে সে ?

—আছে আমাদের দেশেই। আগের মরদটা খুন হবার পর নিকা করেছে তারই এক চাচ্‌তো ভাইকে।

আমাকে নীরব দেখে যোগ করল, সেই শয়তানীটার জন্যেই তো দোস্ত্‌কে দেশ ছাড়তে হ'ল। একদিন খুব ভাব ছিল দুজনের। তারপর কি যে হ'ল ওবাই জানে। হঠাৎ রটিয়ে দিল, তার বুড়ো সর্দারকে নাকি খুন করেছে আফজল।

লোকটা কিছু কিছু উর্দু জানে। আর একটু কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, ছাখ খাঁ সাহেব, তোমার দোস্তের অবস্থা ভাল নয়। বাচবার আশা নেই বললেই চলে। কিন্তু জেলের মধ্যে যারা খানা ছেড়ে দেয়, বাইরের লোকের সঙ্গে তাদের দেখা কববার হুকুম নেই। তোমার বেলায় সে হুকুম আমি দিতে পারি—'

খাঁ সাহেব কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বলে উঠল, 'হুজুর কা মেহেরবানি।'

বললাম, 'কিন্তু সে মেহেরবানি আমি দেখাতে পারি শুধু এক শর্তে।' শর্তের বর্ণনা দিলাম। শুনে মুখ চুন হয়ে গেল পাঠান সর্দারের। মাথা নেড়ে বলল, 'একথা আমি বানিয়ে বলব কেমন করে ? এর কোনোটাই যে সত্যি নয়।'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'বেশ, না বলতে পারো; বলো না। তোমার দোস্তের সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হ'ল না।'

কিছুক্ষণ আপন মনে কি ভাবল পাঠান। তারপর বলল, 'আমি রাজী।'

আমি নিজেই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম হাসপাতালের সেই ঘরটিতে। ঘরে ঢুকবার আগে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলাম সেই শর্তের কথা—'দেখো খাঁ সাহেব, জবান দিয়েছ। কথার খেলাপ যেন না হয়।'

—কভ্‌ভি নেই— দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করল পাঠান।

ভাষাহীন দুটি ঘোলাটে চোখ দিয়ে দোস্তের মুখের দিকে চেয়ে রইল আফজল। যেন ঠিক বুঝতে পারছে না। পাঠানের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। কান্নাবিকৃত কণ্ঠে বলল, 'নিজের হাতে কেন জান দিচ্ছিস, দোস্ত? এই দেখবো বলেই কি অতদূর থেকে ছুটে এলাম। কি জবাব দেবো তোর মার কাছে? সে বুড়ী যে—'

গলায় একটা কাশির শব্দ তুলে আর একবার জানিয়ে দিলাম আমার শর্ত। চকিতে আমার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে আবার সে চোখ ফেরাল দোস্তের মুখের উপর। বলল, 'তোর আসমানী যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল, আফজল।'

—'কি বললি!'—যেন কবরের ভিতর থেকে উঠে এল ভগ্নস্বর। নিষ্প্রভ চোখের তারায় ফিরে এল এক ঝলক প্রাণের জ্যোতি, মরণাহত মুখে একবিন্দু রক্তের আভাস। আর একটু কাছে সরে গিয়ে বলল পাঠান সর্দার, 'তুই তো চলে এলি, দোস্ত; আর আসমানী আজও তোর পথ চেয়ে বসে আছে। নিকে করবার জন্যে কত সাধাসাধি! খানদানি ঘরের কত জোয়ান ছেলে ফিরেও দেখল না। তার মুখে শুধু ঐ এক কথা—'সে ফিরে আসুক আর নাই আসুক, তার জন্যেই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

আফজলের চোখ ছাপিয়ে শীর্ণ গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। বুকের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে এল গভীর নিঃশ্বাস। শীর্ণ হাতখানি বাড়িয়ে বাল্যবন্ধুর একটা হাত ধরে বলল, 'সেই এলি, আর কদিন আগে এলি না কেন দোস্ত্? বড্ড দেরি হয়ে গেছে ভাই, বড্ড দেরি হয়ে গেছে।'

এবার এগিয়ে এসে বললাম আমি, 'কে বললে দেরি হয়ে গেছে? আমি বলছি তুমি বেঁচে উঠবে। আবার দেশে ফিরে যাবে। যাকে চাও, তাকে নিয়েই ঘর বাঁধবে।'

—'হ্যাঁ সাহেব, সেই দোয়া কর। আমি বেঁচে উঠতে চাই,—' তীব্র আগ্রহের সুরে বলল আফজল;—'আমার তো মরলে চলবে না। দাও তোমাদের কি খাবার আছে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবার পর আফজল খাঁকে যখন হাজির করা হ'ল হাঙ্গার স্ট্রাইকের মত মারাত্মক অপরাধের দণ্ড গ্রহণ করবার জন্যে, সে হঠাৎ ছুটে এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার হাতে যা কিছু শাস্তি আছে সাহেব, সব মাথা পেতে নেবো। ডাণ্ডা বেড়ি, খাড়া হাতকড়া, ডিগ্রি বন্ধ্, যা তোমার ইচ্ছে। শুধু যে-কটা রোজ মাপ পেয়েছি সাত বছরের সাজা থেকে, সেটুকু যেন কেড়ে নিওনা। যত তাড়াতাড়ি পার, আমাকে যেতে দাও। তুমি তো সবই জানো।'

১৭৯

শহরতলির এ অঞ্চলটায় কিছুদিন থেকে চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। দোকানের তালা ভেঙে, ধনী গৃহস্থের জানালার গ্রিল কেটে বড় রকম বার্গলারীও হয়ে গেছে দু-তিনটা।

থানার বাবুদের সেই মামুলী সাফাই—পলিটিকাল হাঙ্গামা থামাবো, না চোর ডাকাত ধরবো?

এস্ পি এসে ঘুরে গেছেন দুবার। তাঁর বিশ্বাস, সবই একটা পুরানো, পাকা গ্যাঙের কাজ। ধরা পড়ছে না, তার কারণ সবের মধ্যেই ভূত ঢুকে বসে আছে। তারপরেই একজন নতুন অফিসার পাঠিয়েছেন। সাব-ইনস্পেক্টর অনুপম ঘোষ। তিন চার বছর হল ঢুকেছে পলিশে। বুদ্ধি আছে, কাজ করবার আগ্রহ আছে, এবং সব চেয়ে বড় কথা, অনেষ্ট। অন্তত: এখনো আছে। পরে কী হবে বলা শক্ত।

অনুপম আসবার পরেও দুটো কেস্ হয়ে গেল। কাউকে ধরতে পারে নি। কিছু সন্দেহজনক সূত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু তার উপরে

নির্ভর করে অ্যারেস্ট করা চলে না। রাজনীতিক দলগুলো এক সঙ্গে চেঁচাতে থাকবে। অ্যারেষ্ট যদি বা করে, ধরে রাখতে পারবে না কোর্টে গেলেই জামিন। কিংবা কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই পাড়ার 'দাদারা' এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

এদিকে উপর থেকে ক্রমাগত চাপ পড়ছে। সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্টর এসেছিলেন সেদিন। বলে গেছেন, "আর সাত দিন সময় দিয়েছেন পুলিশ সাহেব। এর মধ্যে কদ্দূর কি করতে পারবে, তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে তোমার সমস্ত কেরিয়ার।"

অনুপম রাউণ্ড বাড়িয়ে দিল। পালা করে দু-জন সিপাই নিয়ে এপাড়া-ওপাড়া টহল দিয়ে বেড়ালো। কোনো কোনো রাত্রে দু-খেপ। ঘুম-টুম উঠল শিকেয়।

কদিন পরেই একটা মারাত্মক ঘটনা পড়ে গেল চোখের সামনে। নামী সোনারূপোর দোকান। গোটা পাঁচ ছয় বড় বড় মজবুত তালা ঝুলছে দরজার গায়। সবগুলো খোলা হয়ে গেছে—ঠুকে নয়, অ্যাসিড দিয়ে গালিয়ে—বাকী শুধু একটা। এমন সময় অনুপম হঠাৎ গিয়ে পড়ল—"হ্যাণ্ডস্ আপ।" একজন পালাল, আরেকজন আর পারল না। হাত তুলে দাঁড়াল পিস্তলের মুখে।

হুইসিল বাজাতে সিপাই দুটিও এসে পড়ল। একজন হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এযে বটুবাবু! অনুপম টর্চ ফেলল লোকটার মুখে। চেনা চেনা বলে মনে হল তারও। থানাতেই দেখে থাকবে বোধ হয়।

বটুবাবুর মুখে এক গাল হাসি। প্রায় গলে গিয়ে হাত জোড় করে বলল, থানার সবাই আমাকে চেনে স্যর। আপনি নতুন এসেছেন কিনা, এখনো আলাপ পরিচয় হয়নি। আমারই গলতি। এবারের মত মাপ করে দিন স্যর। কালই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে—

"লে চলো"—সিপাইদের কড়া নির্দেশ দিল অনুপম। হাতে

হাতকড়া আর কোমরে দড়ি পরিয়ে 'বটুবাবু' কে থানায় নিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হল।

অনেকদিন রাত জাগার পর অজ্ঞান হয়ে ঘুমুচ্ছিল অনুপম। মা-র ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠে বসল। চারদিক অন্ধকার। বাবার অসুখ চলছে কদিন থেকে। সেই কথাটাই মনে হল সকলের আগে। দরজা খুলে বাইরে আসতেই মা শুকনো মুখে বললেন, বড় বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন তোকে। খুব নাকি জরুরী দরকার। আমি বললাম, এই তো সবে এসে শুয়েছে। সিপাই বলে গেল, তাহলেও তুলে দিতে বলেছেন বড়বাবু। এ এক আচ্ছা চাকরি জুটেছে বাপু। ফ্যাসাদ লেগেই আছে। রাত্তিরে যে একটু ঘুমোবে ছেলেটা তারও যো নেই।

বলতে বলতে ওদিকে চলে গেলেন।

অনুপম সার্টটা গায়ে গলাতে গলাতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

থানার আফিসে একা বসে আছেন ও-সি। অত্যন্ত গম্ভীর। অনুপম গিয়ে দাঁড়াতেই ভারী গলায় বললেন 'বসুন'। তারপর আর কথা নেই। অনুপম রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে আছে। পুরো পাঁচ মিনিট পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলে নীরবতা ভঙ্গ করলেন বড় বাবু—"আপনি চাকরিতে ঢুকবার আগে, ইংরেজ আমলে এসব চলত। আমরা অনেক করছি। উপরওয়ালারা নজর দিতেন না। কেউ কেউ বরং স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর সে-সব কারবার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। গবর্মেণ্ট যখন চায় না, দেশের লোক হৈ চৈ করে, তখন কী দরকার? আমাদের চাকরি বাঁচানো নিয়ে কথা। কী বলেন?"

সে তো অবশ্যই। কিন্তু এই তত্ত্ব কথা শোনাবার জন্যেই কি তাকে গভীর রাতে ঘুম থেকে টেনে তোলা হয়েছে? অনুপম চুপ করে রইল। আর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই বড় বাবু আবার

শুরু করলেন, "তবু আমরা যারা পুরানো লোক, মাঝে মাঝে আগের অভ্যেস ছাড়তে পারি না। কিন্তু আপনারা নব্য তন্ত্রের অফিসার। এতটা বাড়াবাড়ি করে ফেলবেন, একেবারেই ভাবা যায় না।"

অনুপম তখনো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তবে বেশীক্ষণ নয়। এর পরেই বড়বাবু অনেকখানি স্পষ্ট হলেন—"দু'চারটা কীল, ঘুষি কিংবা একটা দুটো রুলের ঘা যদি বসান, কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু এ কী করেছেন মশায়! লোকটাকে একেবারে আধমরা করে ফেলেছেন!"

এবার একেবারে আকাশ থেকে পড়ল অনুপম—"কোন্ লোকটা?"

বড়বাবু হাসলেন, "আমার কাছে আর লুকোচ্ছেন কেন, অনুপমবাবু? আসুন।"

সহকারীকে নিয়ে চললেন হাজতের দিকে। দরজার সামনে গিয়ে জোরালো টর্চ জ্বেলে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন?

অনুপম শিউরে উঠল। লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। পিঠময় রক্ত। কেটে কেটে বসে গেছে চাবুকের দাগ।

"এ কী ক'রে হল!" অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মত বলল অনুপম। বড় বাবু সে কথার জবাব না দিয়ে ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, পালাবার টালাবার চেষ্টা করেছিল কি? কিংবা চড়াও হয়েছিল আপনার ওপর?

অনুপম মাথা নাড়ল—"না।"

"তাহলে এতটা মারধোর করবার কী কারণ দেখাবেন আপনি?"

"আমি ওকে মারিনি। আই ডিড্‌নট টাচ হিম।"

"আপনি না মারুন, আপনার হুকুমে সিপাইরা মেরেছে। ইট্‌স্ অল দি সেম্।"

"না; মারবার হুকুমও আমি দিইনি, আমার সামনে কেউ মারেও নি।"

বড়বাবু আবার মুচকে হাসলেন। লোকটার দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন, "অ্যাই"...

সে মাথা তুলে তাকাল।

"কে মেরেছে তোকে? ঠিক কথা বলবি। মিথ্যে বললে ডবল সাজা হয়ে যাবে।"

সে উঠে বসে হাত দিয়ে অনুপমকে দেখিয়ে দিল। অনুপম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "আমি মেরেছি তোমাকে?"

আসামী চুপ করে রইল, যার অর্থ—হাঁ।

"কোথায়?"

"থানার সামনে, পুকুর পাড়ে। দু'জন সিপাই পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।"

এর পরে আর কী বলবে অনুপম? বড়বাবু ফিরে যেতে যেতে বললেন, ও ব্যাটা চোর। আচারালি ওর কথা আমি বিশ্বাস করিনি। সিপাই দুটোকে ডেকে ঘটনাটা জানবার চেষ্টা করলুম।

"কী বললে তারা?"

"ঐ কথাই বলল। আরেকবার ডাকাচ্ছি আপনার সামনে।"

"দরকার নেই,"—বেশ কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গে বলল অনুপম।

বড়বাবু ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, আপনার বয়স অল্প। সহজে উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। তবু বলছি, এ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ব্যাপারটা যে খুব সিরিয়াস নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ...এবার আমাকে কী করতে বলেন?

"আমি আর কী বলবো? আপনি যা ভাল বোঝেন করুন।"

"আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন। যদি চেপে যাই, আমার নিজেরই বিপদ। কেননা, ব্যাপারটা চাপা থাকবে না। অতগুলো ইনজুরী রয়েছে। আর যদি আসামীর ষ্টেটমেণ্ট রেকর্ড করে ওপরে পাঠাই, ডি-এস্-পি অজয় গুপ্ত আসবে এনকোয়ারীতে। তাকে তো আপনি ভালো করেই জানেন। তারই বা দোষ কী? হাওয়া যে-দিকে বইছে, সেই দিকেই তো চলতে হবে। ফস্ করে আপনার

সাসপেনশন অর্ডার এসে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ৩২৪ কিংবা ২৬ ধারায় মামলা দায়ের হবে।

অনুপমের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বাবার ঐ অবস্থা। বোনের বিয়ে দিয়েছিল বছর দুয়েক আগে, মোটা টাকা দেনা করে। মাস তিনেক হল একটা কচি বাচ্চা কোলে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে! আরো চারটে ভাইবোন। সবগুলো পড়ছে। মা আছেন। গোটা সংসারের ভার তার একার ওপর।

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বড়বাবুর কথায় চমক ভাঙল। তিনি বলছিলেন, "একটা পথ আছে।"

ও-সির মুখের উপর সাগ্রহ দৃষ্টি ফেলল অনুপম। তিনি একটু থেমে তারপর যোগ করলেন, "ঐ আপদটাকে ছেড়ে দিন।"

"ছেড়ে দেবো!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অনুপম।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান, কথাটা আগে শেষ করতে দিন। ওর বদলে আরেকটাকে এনে পুরলেই হল। আমাদের কিছু করতে হবে না। ও-ই জুটিয়ে দেবে। তার নামে মামলা চলবে। আপনারা সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। এ ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না। আপনার দিকে চেয়েই বলছি। আপনার সাংসারিক অবস্থা তো আমি জানি।"

অনুপমের প্রবল ইচ্ছা হল, সামনের ঐ প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে শুধু দুটো কথা লিখে দেয়—"আই রিজাইন"। তারপর সেটা ঐ লোকটার মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু হাত উঠল না। যেমন ছিল তেমনি নিঃশব্দে বসে রইল।

তখন সকাল হয়ে গেছে। থানা থেকে বাসায় ফিরতে একটা ঝোপ পেরোতে হয়। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটো সিপাই, যার সঙ্গে যারা রাউণ্ডে ছিল। একজন হাত জোর করে বলল, আমাদের অপরাধ নেবেন না, স্যর। বড়বাবু গারদ থেকে ডাকিয়ে নিয়ে শাসিয়ে দিলেন, 'বটু যা বলছে তোমাদেরও তাই বলতে হবে। তা না হলে চাকরি থাকবে না।'

আরেক জন অনুনয়ের সুরে যোগ করল, গরীব মানুষ স্যর। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করি।

অনুপম জানতে চাইল, লোকটাকে মারল কে?

"উনি নিজেই, আর কে? সবটাই অবিশ্যি আপসে। ওর ওপর খানিকটা রাগও ছিল পাওনা-টাওনার ব্যাপারে। এই সুযোগে মনের ঝাল মিটিয়ে নিলেন।"

অন্য সিপাইটি বলল, কিন্তু লোকটাকে ধন্যি বলতে হবে। বেতের মুখে পিঠের মাংস উঠে এল, একটা রা পর্যন্ত করল না।

"তা কয়েক টুকরো মাংসের বদলে যদি এতবড় একটা মামলার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়, রা করতে যাবে কেন? তাছাড়া মার-টার ওদের লাগে না।"

ঐ দিনই একটা জরুরী তদন্ত ছিল। সেটা সেরে একবার সদরেও যেতে হবে। সকাল সকাল বেরোনো দরকার। মাকে আগের দিনই বলে রেখেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি উনুনে আঁচ দিয়ে ডাল ভাত আলুভাজা করে দিলেন। অনুপম খেতে চাইল না। মায়ের পীড়া-পীড়িতে গিয়ে বসল। দু এক গ্রাস মুখে দিতেই গা পাক দিয়ে উঠল। আসামীর মাংস-উঠে-যাওয়া রক্তাক্ত পিঠটা তখনো চোখের উপর ভাসছিল।

রাত ন'টা নাগাদ ফিরে আসতেই সাত-আট বছরের ছোট বোনটা ছুটতে ছুটতে এসে হাত জড়িয়ে ধরল। চোখ মুখ থেকে উপচে পড়ছে খুশি। বলল, জানো দাদা, আজ আমাদের মাংস রান্না হয়েছে।

"মাংস!" সকালবেলার দৃশ্যটা মনে পড়ল অনুপমের। তাকিয়ে দেখল, সকলের মুখেই লোলুপ খুশির ঝলক।

মা-ও হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, একজন লোক দিয়ে গ্যাছে দুপুর বেলা। বলল বটুবাবু পাঠিয়েছে। বাবু চেনেন।... তুই আর দেরি করিসনে। হাতমুখ ধুয়ে আয়। ওবেলা তো দুটো গেরাস মুখে না তুলেই উঠে পড়লি।

ছায়া

ডাক্তার বামাপদ হালদার হার্ট-স্পেশালিস্ট। সরকারী চাকরি করেন। এক সময়ে মুর্শিদাবাদ সদর হাসপাতালে এসিস্ট্যান্ট সার্জেন ছিলেন। তখন দূর দূরান্তর থেকে অনেক দুরারোগ্য হার্টের রোগীর ভিড় জমে যেত। তারপর বাঁকুড়ায় সিভিল সার্জন হয়ে গেলেন। প্রমোশন হল বলে মুখে আনন্দ প্রকাশ করলেও মুর্শিদাবাদের লোকেরা মনে মনে দুঃখিত হয়েছিল। তিনি নিজেও খুশী হননী। এক বন্ধুকে বলেছিলেন। স্টেথস্কোপ ধরব কখন, সারাদিন তো শুধু অফিসে বসে কলম পেষা। তার ওপরে মাসের মধ্যে পনের দিন জীপে চড়ে ধুলো খাও।

তবু ওরই ফাঁকে ফাঁকে অন্ততঃ কয়েকটা করে রোগী দেখে বিদ্যাটা একবার ঝালিয়ে নিতেন। তাতেও বাদ সাধলেন হেড-অফিস।

সকালের ডাকটা তাঁর বাড়িতে আসত। সেদিন একখানা চিঠি পড়ে খানিকক্ষণ থ হয়ে বসে রইলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন স্ত্রীকে এবং আসতেই বললেন, ছাখ কী সর্বনাশ। আমাকে এবার জেলে পাঠাতে চান কত্তারা।

—অ্যাঁ! চমকে উঠলেন ইন্দিরা।

—না না; সে জেল নয়। জিজ্ঞেস করছেন আমি '—' সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হতে রাজী আছি কি না।

—তাই নাকি। ইন্দিরার চোখে মুখে উল্লাস ছাপিয়ে উঠল। এ তো রীতিমত সুখবর। অমন মুখ চূণ করে ভাববার কী আছে?

—আমি ডাক্তার মানুষ, জেলের কি জানি? তাই ভাবছিলাম, 'না' বলে দিই।

—ফেঁপেছ! কী চমৎকার বাড়ি জানো? তার সঙ্গে মস্ত বড় পুকুর আর তরিতরকারির বাগান। তোমার এখানকার মত একটা টিনটিনে মালী নয়, অনেকগুলো করে কয়েদী পাওয়া যাবে। তাছাড়া জেলের চাকরিতে খাতির কত! একগাদা সিপাই সান্ত্রী, কথায় কথায় সেলাম। সব চেয়ে বড় কথা, কলকাতার অত কাছে। সারাজীবন তো শুধু বাইরে বাইরেই ঘুরলাম। এ সুযোগ কখনো ছাড়তে আছে? এখনি উত্তর দিয়ে দাও। আমি প্যাকিং শুরু করছি।

হালদার সাহেবের কোন আপত্তি টিকল না। বাইরের 'উপর-ওয়ালা' শুধু প্রস্তাব পাঠিয়ে তাঁদের ইচ্ছাটা জানিয়েছিলেন, ঘরের 'উপরওয়ালা' সরাসরি রায় দিয়ে বসলেন। সেই দিনই চিঠি চলে গেল।

দুর্বল হার্ট নিয়ে যার কারবার, তেমন একজন নিরীহ ডাক্তারকে ধরে নিয়ে অতবড় একটা জেলের মাথায় বসিয়ে দেবার তাৎপর্যটা কী, হালদার সাহেব বুঝে উঠতে পারলেন না। বিস্ময়টা কথায় কথায় একদিন একজন বন্ধু ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রকাশ করতে তিনি বললেন, ও, তা জানেন না বুঝি? তবে শুনুন, এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে। 'আই-সি-এস' এর স্কন্ধের ওপরেই যে বৃটিশ সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে, সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। চার্চিল সাহেব বলেছিলেন, স্টীল ফ্রেম। এত বড় অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের গোটা ভারটাই ওদের ওপর। ওরা সবজান্তা। সমস্ত কর্তৃত্ব ওদের হাতে। আজ ডি, এম, কাল ডিরেক্টর অব্ এগ্রিকালচার, পরশু হাই-কোর্টে জজ, তারপর দিন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর। আই-এম -এস্ এর বাঁধাধরা এক রাস্তা। সিভিল লাইনে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট্ ছাড়া আর কোথাও ওদের পাত্তা নেই। অথচ, ওরাও তো 'অল ইণ্ডিয়া সার্ভিস' এর লোক, তার ওপরে, লড়াই লাগলে ওদের ছাড়া গতি নেই। তখন ওরা আসল মিলিটারির সমান সমান

—ক্যাপটেন, মেজর, লেফটেনাণ্ট্ কর্ণেল। সেই সব কথা উল্লেখ করে ক্ষোভ জানান হল সেক্রেটারী অফ স্টেটের কাছে। ভদ্রলোক লোক ভাল ছিলেন। ভেবেচিন্তে বললেন, আচ্ছা ডাক্তারি ছাড়া আরেকটা জায়গা তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হল—সেণ্ট্রাল জেল্। ডাক্তারও বটে, মিলিটারিও বটে। ওখানে তোমাদের মানাবে ভাল।

বামাপদ বললেন, কিন্তু আমরা তো মিলিটারির 'ম'-ও জানি না; একটা বন্দুকও কোনদিন চোখে দেখিনি।

—আপনারা পাচ্ছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, যাকে বলে by law of inheritance, আই-এম-এস এর জায়গায় বি-এম-এস। ওদের এখন পাচ্ছে কোথায়? সব তো লড়াইতে টেনে নিয়ে গেছে।

নতুন চার্জ নেবার পর ডাক্তার হালদার সকাল সাতটায় ভয়ে ভয়ে অফিসে গিয়ে ঢুকলেন। প্রথমেই 'রিলিজ', অর্থাৎ কয়েদীদের খালাস পর্ব। ঐ দিন যাদের মেয়াদ শেষ হল, তাদের সব লাইন করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন ডেপুটি জেলর একটি একটি করে নাম ডাকছেন এবং মন্ত্র পড়ার মত গড়গড় করে একরাশ কি বলে যাচ্ছেন। বামাপদ খানিকক্ষণ শুনবার পর বুঝলেন, সেগুলো ওদের নাম, ধাম, বিবরণ, কত মেয়াদ ছিল, কদিন মাপ পেল তার থেকে, ইত্যাদি। তাঁর সামনে দশ সেরী ওজনের একটা বিশাল খাতা। তার মধ্যে ঐগুলো লেখা আছে এবং মিলিয়ে নিয়ে শেষ পংক্তিতে তাঁকে সই করতে হবে। রামের বদলে শ্যাম না চলে যায়, তারই জন্যে এই হুঁশিয়ারি। সেরকম দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তাঁকেও তার দায়িত্ব নিতে হবে। দেখে শুনে প্রাণ উড়ে গেল বামাপদবাবুর। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলেন, পাছে কোথাও ভুল হয়ে যায়। ডেপুটি মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। আই-এম-এস সাহেবরা এসব কিছু দেখত না, শুনতও না; আপন মনে পাইপ টানত। তার পর ঘস্ ঘস্ করে সই বসিয়ে দিত।

নাম ধাম মেলাবার পর ডেপুটি কারো কারো হাতে কিছু পয়সা দিচ্ছেন, কাউকে এমনিই বলছেন, যাও। . তারই একজন বলে বসল, নালিশ আছে হুজুর।

—কী নালিশ ? জানতে চাইলেন বামাপদ।

—দয়া করে কিছু খোরাকী দেবেন। অনেকদূর যেতে হবে। এ বিষয়ে জেল কোড্ কি বলে সুপারকে জানিয়ে দিলেন ডেপুটি জেলর। জেল থেকে পাঁচ মাইলের মধ্যে যাদের বাস, তারা কোন খোরাকী পায় না। এ লোকটার বাড়ি ঘর বলতে বিশেষ কিছু নেই। মাইলদেড়েক দূরে যে বস্তিটা আছে, সেখানে কোথায় থাকে এবং ছোটখাট চুরি চামারি কেস্এ প্রায়ই ওকে জেলে আসতে দেখা যায়।

সে প্রতিবাদ করল, না, হুজুর আমাব বাড়ি ধানবাদ। দেখুন না, ওয়ারেণ্টে লেখা আছে।

ওয়ারেণ্ট উল্টে দেখা গেল, তার ঠিকানা লেখা আছে, এলাহাবাদ। লোকটা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল, ঐ একই হল। যে ধানবাদ, সেই এলাহাবাদ।

ডেপুটি আসল ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা কবলেন। ধানবাদ বা এলাহাবাদ কোনোটাই ও চোখে দেখেনি। সাজা হবার পব পেশকার যখন ওয়ারেণ্টের ঘর ভর্তি করেন, তার প্রশ্নের উত্তরে ওরা যা খুশী বলে দেয়, পরে আর মনে করতে পারে না। সুপার সব শুনবার পর ইংরাজীতে বললেন, কিন্তু ওয়ারেণ্টে যখন রয়েছে, এবং তার নীচে কোর্ট সই করেছেন, তখন ওটাই আমাদের মেনে চলা উচিত।

এলাহাবাদ-এর পথ-খোরাকী মঞ্জুর হল।

খালাস শেষ হবার পর ডেপুটি যখন অন্যান্য কাগজপত্র সই করাচ্ছেন, দরজার সামনে থেকে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, আসতে পারি ?

দীর্ঘাঙ্গ প্রিয়দর্শন যুবক। মুখে কিঞ্চিৎ দম্ভের ছাপ, পরণে ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। ডেপুটি নীচু গলায় বললেন, ডেটেনিউ সুরজিৎ দত্ত, বড় জ্বালাতন করে।

"স্বদেশী" বন্দী অর্থাৎ পলিটিক্যাল প্রিজনারদের খবর সুপার আসামাত্রই পেয়েছিলেন। শ'খানেক ডেটেনিউ, তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ও বিচারাধীন আরও শ'দুয়েক। জেলে বসে আর কিছু করবার নেই বলে, কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে উত্যক্ত করাই তাদের একমাত্র কাজ, একথাও শুনেছিলেন।

সুরজিৎ এসে অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং কোনরকম ভূমিকা না করে বললেন, আপনার গুদামীবাবুটিকে বদলাতে হবে।

গুদামীবাবু মানে স্টোর-কীপার। এদের প্রয়োজনমত মালপত্রের সরবরাহের ভারও তার উপর। বামাপদ অভিযোগটা জানতে চাইলেন। সুরজিৎ বললেন, শ'দুয়েক কইমাছের অর্ডার দিয়েছিলাম ডেটেনিউ-কিচেনের জন্য। উনি সোজা বলে দিয়েছেন, "দিতে পারবো না; কই মাছের ফ্যাক্টরি নেই আমাদের।"

একটা বিশাল চাবির তাড়া হাতে ঝুলিয়ে একটু উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকলেন গুদামীবাবু এবং ডেটিনিউর কথার উত্তরে বললেন, "কি রকম কই মাছ চাইছেন, সেটা চেপে গেলেন কেন? স্পেসিফিকেশন (Specification) টাও জানিয়ে দিন সাহেব বাহাদুরের সামনে।"—

"স্পেসিফিকেশন আবার কি!" দু'চোখে বিরক্তির ভ্রূকুটি তুললেন সুরজিৎ; তারপর সুপারের দিকে ফিরে বললেন, "বলছিলাম, মাছগুলো যেন *ঠিক* এক সাইজের হয়। ছোট বড় হলে ডিস্ট্রিবিউশনে অসুবিধা আছে, ছেলেরা বড় গোলমাল করে।"

—"বুঝুন স্যার," সাহেবের কাছে বিচার প্রার্থী হলেন স্টোর-কীপার, "দু'শ কইমাছ *ঠিক* এক সাইজের হওয়া চাই। উনিশ বিশ হলেই রিজেক্ট্।"

—"উনিশ বিশ হবে কেন?" খানিকটা ধমকের সুরে বললেন ডেটিনিউ, "আপনার ঠিকাদার প্রভু যদি একটু চেষ্টা করেন, দু'শ এক মাপের কই জোটানো এমন কিছু কঠিন নয়। এক বাজারে না পায়, পাঁচ বাজার থেকে আনবে।"

"কী ব্যাপার? সুরজিৎবাবু কি মনে করে?" বলতে বলতে জেলরবাবু ঘরে ঢুকলেন। সুপার তাঁকেই খবর পাঠাতে যাচ্ছিলেন। এসে পড়াতে যেন অনেকটা ভরসা পেলেন। বললেন, ওদের কই মাছ নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

—"কই মাছ? বেশ তো; সাহেবের রাউণ্ডটা হয়ে যাক। তারপর আপনাদের সব সমস্যা মিটিয়ে দেওয়া যাবে।"

—"না, আপনারা দিতে পারবেন, কি না পারবেন, আমি এখনই জেনে যেতে চাই।"

জেলর তখন স্টোর-কীপারের দিকে তাকালেন এবং তার কাছে ডেটিনিউদের দাবীটা জেনে নিয়ে বললেন, "এ আর বেশি কথা কি? দেবো আপনাদের মাছ। তবে তাব জন্য কিছুটা সময় দিতে হবে।"

—কতটা সময় চান? একদিন?

—আজ্ঞে না; অন্ততঃ দেড় বছর।

—দেড় বছর!!

—তার কমে হবে না। আপনার অডার আমরা ফিশারী ডিপার্টমেণ্টে পাঠাবো। তারা তাদের রিজার্ভ ট্যাঙ্কে ডিম ফেলবে। সেগুলো ফুটবে, বড় হবে। তা, বছর দেড়েক লাগবে বৈকি?

—আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?

—আজ্ঞে না; ঠাট্টা করবো কেন? ঠিক এক সাইজের মাছ পেতে হলে এছাড়া তো আর অন্য উপায় দেখি না।

ডেটিনু রাগে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

সুপারের প্রথম দফা কাজ শেষ হয়েছিল। এবারে রাউণ্ড। সঙ্গে চলেছেন জেলর, জনচারেক ডেপুটি জেলর, ডাক্তার, চীফ্ হেডওয়ার্ডার

এবং আগেপিছে চারজন বেটনধারী ওয়ার্ডার। 'ঈনার গেট (Inner-gate) পার হয়ে জেলের ভিতরে পা দিতেই একজন কয়েদীর হাতে যে বস্তুটি তাঁর নজরে পড়ল, সেইদিকে কিছুক্ষণ বড়বড় চোখ করে তাকিয়ে রইলেন—সাধুভাষায় যাকে বলে বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু। মুখ থেকে আপনা থেকেই বোধহয় বেরিয়ে এল—"কী এটা!"

—"আপকা ছাতা হ্যায়," দীর্ঘ সেলাম ঠুকে সবিনয়ে নিবেদন করল চীফ হেডওয়ার্ডার ভীষ্মলোচন সিং। বামাপদ এবার লক্ষ্য করে দেখলেন, ছাতাই বটে, তবে রামছাতা। আস্ত একটা মোটা বাঁশের তৈরী বাট, শিকগুলো শিক নয়, গোটা গোটা পাহাড়ী গল্লা বেত (যা দিয়ে চেয়ারের পা তৈরী হয়) আগুনের তাপ দিয়ে বাঁকানো, তার উপরে সাদাকাপড়ের ছাউনি। অর্থাৎ, একটি মাঝারি আকারের সামিয়ানা; তার তলায় জনদশেক মানুষ অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারে। ছত্রধর ব্যক্তিটিও কম দ্রষ্টব্য নয়। ছ'ফুটের উপর লম্বা, চওড়াও সেই অনুপাতে। খাঁড়ার মত নাক, তার নীচে সাদায় কালোয় মেশানো জমকালো গোঁফ। হঠাৎ মনে হবে, বিড়ালের ল্যাজের শেষ দিকটা কেটে লাগিয়ে দিয়েছে ঠোঁটের উপর। দাড়িটা দ্বিখণ্ডিত এবং দু'টো ধার তুলে নিয়ে কানের সঙ্গে বাঁধা। ছাতা নামক সেই বস্তুটি খুলে নিয়ে সে যখন এগিয়ে এল, বামাপদর বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠলো। বললেন, "নেহি লাগেগা। হামকো পাস্ টুপি হ্যায়।" বলে, তাড়াতাড়ি টুপিটা পরে নিলেন। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। এ কোন্ দেশী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট! ছাতার কাজ টুপি দিয়ে সারতে চায়। এরকম ভেতো সাহেব, কয়েদীরা মানবে তো? সিপাইরাও বা ভয় করবে কেন?

কিছুক্ষণ কারও মুখে কোন কথা সরল না। তারপর জেলরবাবু মনে করলেন, ছাতার তাৎপর্য ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে নতুন সাহেবকে ওয়াকিবহাল করা তাঁরই কর্তব্য। সেই চেষ্টা করলেন? ছাতাটা যে এখানে টুপির বিকল্প নয়, কারাধ্যক্ষের পদমর্যাদার প্রতীক, তাঁর

বিশাল কর্তৃত্বের পরিচয়, এর সঙ্গে এত বড় জেলের ডিসিপ্লিন বা শৃঙ্খলার প্রশ্নও জড়িত—ইত্যাদি তথ্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন।

সব শুনেও বামাপদবাবুর কেমন লজ্জা করতে লাগল। একগাদা পলিটিক্যাল প্রিজনার রয়েছে জেলে। কেউ কেউ তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাদের সামনে দিয়ে মস্ত একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে প্রসেশন করে ঘুরে বেড়ানো! অসম্ভব। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, "আপনাদের রাজত্বে এসে যখন পড়েছি, সব সয়ে নিতে রাজী আছি, কিন্তু ওটা চলবে না। না, মশাই, থিয়েটার করা আমার অভ্যাস নেই। ঐ রকম একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ছত্রপতি শিবাজী সাজতে পারবো না।"

দিনচারেক পরে। সোমবার। সুপারের সাপ্তাহিক 'ফাইল'। তামাম জেলের সাধারণ কয়েদীরা ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে লাইন করে দাঁড়াবে। সাহেব সদলবলে চলে যাবেন তাদের সামনে দিয়ে, শুনবেন, কার কি বলবার আছে, জানাবার আছে কোন নালিশ, অভিযোগ, আবেদন বা নিবেদন।

প্রথম নালিশ এল সেই ছত্রধর পেশোয়ারীর কাছ থেকে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জানালো, মেডিক্যাল অফিসার তার দৈনিক ভাতা বন্ধ করে দিয়েছেন।

দৈনিক ভাতা! চোখ কপালে তুললেন বামাপদ। কয়েদী আবার ভাতা পায় নাকি? জেলরের মুখের দিকে তাকাতে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন—আর কেউ পায় না। ও-ই শুধু পায়। ছাতা ধরার ভাতা। অতবড় একটা ছাতা বয়ে নিয়ে বেড়াবার জন্য যতখানি গায়ের জোর দরকার, জেলের সাধারণ খাদ্য সেটা যোগাতে পারে না। তাই মেডিক্যাল অফিসারের সুপারিশ অনুসারে এক্স্ট্রা বা বাড়তি খাদ্য হিসাবে রোজ আধসের করে মাংস ওর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। ছাতা ধরা বন্ধ হবার পর সে অ্যালাউন্সটা তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

জটিল সমস্যা! বামাপদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ওকে অন্য কোন খাট্‌নির কাজ দেওয়া যায় না?

—এরকম ভারী অথচ সম্মানের কাজ আর কিছু নেই। তাছাড়া ও তো সাধারণ কয়েদী নয়, মেট। 'হার্ড লেবার' (Hard labour) বলে যে সব কাজ নির্দিষ্ট আছে জেল কোডে, সেগুলো ওর করবার কথা নয়। আইনে নিষেধ আছে।

—তা হলে আর কি করা যাবে? ওকে বুঝিয়ে দিন, ছাতা যখন আর ধরতে হচ্ছে না, সাধারণ খাবারের ওপর আর কোনো বাড়তি অ্যালাউন্স ওর প্রাপ্য নয়।

বুঝিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বোঝালেই কি সকলে সব জিনিস বোঝে? একবাব যা পাওয়া যায় তাকে বরাবরের পাওনা বলে ধরে নেওয়াই মানুষের স্বভাব। পেশোয়ারী মুখে কিছু না বললেও, হাবভাবে বুঝিয়ে দিল যে, সে বোঝেনি, অর্থাৎ বুঝতে চায় না।

এরপরেই মেডিক্যাল্‌ অফিসার স্পারের সঙ্গে দেখা করে বললেন, লোকটা মাংস না পেয়ে যেরকম ক্ষেপে রয়েছে, কোন দিন আমাকেই হয় তো মাংস বানিয়ে ফেলবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন না? ছাতা ধরুক, আর না ধরুক, ওর টিকিটে ঐ 'আমব্রেলা-হোল্ডার' (umbrella-holder) কথাটা আবার লিখে দিতে বলুন। আমিও তাহলে নষ্ট ভাতাটা উদ্ধার করতে পারি।

বামাপদ মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। মেডিক্যাল অফিসার বুঝলেন, এসব কারচুপি এখানে চলবে না।

পরদিন ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠলো। সকালেই খবর নিয়ে এল চীফ্‌ হেড-ওয়ার্ডার। পেশোয়ারী হাঙ্গার-স্ট্রাইক করেছে! মাংস মঞ্জুর না হলে আমরণ অনশন। অর্থাৎ লোকটার জন্য কিছু করবার ইচ্ছা থাকলেও, আর তার সম্ভাবনা রইল না। জেলের আইন এ বিষয়ে অত্যন্ত সরল। যে কোনো কারণেই

হোক, একবার যদি কেউ হাঙ্গার-স্ট্রাইক শুরু করে, সেটা বন্ধ না করলে, অর্থাৎ বিনা সর্তে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার কোনো কথাই শোনা হবে না।

কারাধ্যক্ষ বিশেষ বিচলিত না হলেও, কাবাপাল অর্থাৎ জেলর বড় ভাবনায় পড়লেন। হাঙ্গার-স্ট্রাইক চেপে রাখা যায় না ; সরাসরি সরকারের কাছে বিস্তাবিত বিপোর্ট দেওয়া অবশ্য করণীয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিপদ বাধিয়েছে ঐ ছাতা। হাঙ্গার-স্ট্রাইকের কারণ দেখাতে গিয়ে ঐ বস্তুটির উল্লেখ না করে উপায় নেই। অথচ করতে গেলেই প্রশ্ন উঠবে—কিসের ছাতা, কবে তৈবী হল, ব্যয় পড়েছিল কত, তার স্যাংশন বা মঞ্জুরি কোথায় ইত্যাদি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। আসলে সবটাই আন্‌অফিসিয়াল। জেলেব 'স্টক্‌বুক' এ ঐ আপদটার কোনো বেকর্ড নেই। তৈরী কবতে খরচ যা হয়েছে (নেহাত কম নয়) তাও 'ডান হাত বাঁ হাতের' ব্যাপার। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। অর্থাৎ বানানো হয়েছে ছাতা, জমার ঘবে লেখা হয়েছে রান্নার ডেক কিংবা বাগানের কোদাল। কোন্ লেফটেন্যাণ্ট্ কর্ণেল জাঁদরেল বস্‌কে খুশী ক তে গিয়ে কে কি ভাবে এই কাণ্ডটি করে গেছেন, কেউ জানে না। কিন্তু সে কথা বলে বর্তমান স্টাফ্-এর পার পাবার উপায় নেই। হেড-অফিস বেঁকে বসলে জেলর স্বয়ং ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।

গত্যন্তর না দেখে ভদ্রলোক অনেক ভেবে চিন্তে অতঃপর সাহেবের 'কুঠীতে' গিয়ে উপস্থিত হলেন। কদিনেই রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, খামাপদর প্রতিটি পদক্ষেপ যিনি পরিচালনা করেন, তিনি একজন বামা। তাঁরই শরণ নিলেন জেলরবাবু। পুকুর, বাগান এবং অন্যান্য "হোম্ অ্যাফেয়ারস্" (Home affairs) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এবং কার্যকরী সাহায্যের ঘন ঘন প্রতিশ্রুতি দেবার পর আসল বক্তব্যটা পেশ করলেন। মিসেস হালদার সব কিছু শুনে মৃদু হেসে বললেন, কাল সকালে সিপাইরা যখন ওঁকে বাংলো থেকে এস্‌কর্ট্ করে নিতে আসবে সেই সঙ্গে ছাতাটাও পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন অফিসে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নীচে এসেই চমকে উঠলেন বামাপদ, 'একি! এটাকে এখানে কে নিয়ে এল?'

—'আমি আনিয়েছি।' পেছন থেকে বললেন 'মেমসাহেব'।

—'তুমি! কিন্তু—'

—'কিন্তু আবার কি? তুমি কি এখনো সেই ডাক্তার সাহেব আছ যে, একটা সোলার টুপি মাথায় দিয়ে ট্যাং ট্যাং করতে করতে অফিস যাবে? তুমি এখন 'সেণ্ট্রাল' জেলের বড় সাহেব। ঐ রকম একটা আচ্ছাদন না হলে মানাবে কেন? এই, খোলো।'

হুকুম পাওয়া মাত্র ছাতা খুলে তুলে ধরল পেশোয়ারী। বামাপদ আর কী করেন? নিঃশব্দে গিয়ে তার তলায় দাঁড়ালেন। এগিয়ে চললো প্রসেশন।

ফার্স্ট প্রাইজ

কী হল?

মহিম রায় বন্ধুর প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ফোলিও ব্যাগটা পাশের সোফায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সামনে যে কৌচটা ছিল তার উপর বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালেন। এর পরে উত্তরের আর দরকার ছিল না। তবু বন্ধু দাশ নেহাৎ কিছু একটা বলবার জন্যেই বললেন, দিলে না বুঝি?

না।

কী বললে?

টাকা নেই।

টাকা নেই! ব্যাটাচ্ছেলে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছে

আর তার সবটাই কালো। সেখান থেকে কিছু ছাড় না? তোরই তো সুবিধে। খানিকটা তবু হালকা হলি।

মহিমবাবু হাসলেন, হালকা হবার জন্যে ওর কোন গরজ নেই। ধরে কে? তাছাড়া শোনা যাচ্ছে হাউস-প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করলে কালো টাকা সাদা বলে মেনে নেবে গবর্মেণ্ট। শীগগিরই নাকি আইন পাশ হচ্ছে পার্লামেণ্টে। ও হয়তো সেই অপেক্ষাতেই আছে। তোমাদের এই নিউ আলিপুরে যে কটা খালি প্লট পড়ে আছে সব কিনে নিয়ে এক একটা দশ বারোতলা ফ্ল্যাট তুলবে। আর ভাড়ার টাকায় বসে বসে খাবে।

যা বলেছ। সেই সঙ্গে আমাদেরও ফ্ল্যাট করে দেবে, আমি আর আমার মত কতগুলো বুড়ো, যারা চাকরি থেকে রিটায়ার করে সর্বস্ব দিয়ে একখানা বাড়ি করেছে, আর তারই খানিকটা ভাড়া দিয়ে কোন রকমে কবে খাচ্ছে।

ঠিক তাই। আমরা তো গেছিই, তোমাদরও ঘোর দুর্দিন আসছে।

বঙ্কু দাশের মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল। ধীরে ধীরে বললেন, তার মানে মধ্যবিত্ত বলে যে একটা জাত এখনো আছে, আসলে যাদের কোন বিত্তই নেই, তারা একেবারে লোপাট হয়ে যাবে।...সে যাকগে; এবার তোমার খবর বল। পটলডাঙ্গার কারখানাটা চলছে তো?

এখনো চলছে, তবে শীগগিরই পটল তুলবে। ইউনিয়নের পাণ্ডারা আলটিমেটাম দিয়ে গ্যাছে বোনাস না বাড়ালে স্ট্রাইক। ঐ জন্যই তো টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম। তাছাড়া দেনা-টেনাও আছে কিছু।

কত টাকা চাই?

অন্তত হাজার দশেক।

বঙ্কুবাবু মিনিটখানেক কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, এক কাজ

কর না কেন? তোমার স্ত্রীর তো অত গয়না আছে, তার কয়েকখানা হলেই তো সমূহ বিপদ কিছুটা অন্তত কেটে যায়! তার পর আস্তে আস্তে—

মহিম হাসলেন, তুমি ভুলে যাচ্ছ বন্ধু, আমার স্ত্রী জাতিতে স্ত্রীলোক, যারা প্রাণ দেয়, কিন্তু গয়না দেয় না।

বন্ধু আর ঐ প্রশ্নে ঢুকলেন না, উক্তিটা বোধ হয় মনে মনে মেনে নিলেন। অন্য দিকে গেলেন, ছেলের পেছনেও তো কম টাকা ঢালনি। অত বড় ডাক্তার হয়ে ফিরেছে বিলেত থেকে। বেশ ভাল রোজগার শুনেছি।

আমি ও শুনেছি।

এমন একটা সুর ছিল মহিমের মুখের শব্দ দুটির মধ্যে যে বন্ধু আর ঐ প্রসঙ্গে অগ্রসর হলেন না। বুঝলেন বন্ধুর সেটা ইচ্ছা নয়। তাছাড়া তিনি নিজেও জানেন, 'কর্তব্য' 'কৃতজ্ঞতা' এমন ধারা যে সব কথা তাঁরা তাঁদের কালে জেনেছেন এবং মেনে এসেছেন, সেগুলোকে এখন ডিক্সনারী ছাড়া অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া শক্ত। কর্তব্য যদি কোথাও থাকে সেটা নিম্নগামী। বাপ ছেলের জন্যে করবে, করতে বাধ্য। কিন্তু ছেলে—

বন্ধুবাবুর চিন্তাসূত্রে হঠাৎ টান পড়ল। মহিম উঠে পড়ে বললেন, চলি।

কোথায় যাবে এখন? বস, একটু চা খাওয়া যাক। তারপর ভেবেচিন্তে একটা কোন উপায় তো বের করতে হবে।

মহিম আবার বসলেন। কথাবার্তা চলল বিশেষ করে সেই মামুলী ধারায়, মোটামুটিভাবে সকলেই যা জানে—স্বল্প পুঁজি বাঙালীরা এপাড়ায় যে সব ছোটখাটো কল কারখানা গড়ে তুলেছিল, বেশির ভাগই ধার দেনা করে, তাদের অবস্থা ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ছে। কতকগুলো তো উঠেই গেছে, বাকীদেরও প্রাণ যায় যায়। কারণগুলোও কারো অজানা নয়। মালিক-শ্রমিকে যে পরস্পর

দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ছিল, অনেকটা ব্যক্তিগত ধরণের, বাইরের লোক এসে তাতে ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে। তারা মুখে বলছে আমরা শ্রমিকের স্বার্থ চাই, কিন্তু আসলে চাইছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং সেটা প্রায়শ রাজনৈতিক। তার ফলে কাজকর্ম কিছুই হচ্ছে না এবং দুপক্ষই মার খাচ্ছে।

এই সব শিল্প, সরকারী ভাষায় যার নাম স্মল-স্কেল ইনডাষ্ট্রিজ, তাদের দুর্দশার *জন্যে* সবকারও কম দায়ী নয়। লাইসেন্স বণ্টনে নানারকমের পক্ষপাত দৈনন্দিন ঘটনা। ক্ষমতা হাতে নিয়ে যাবা বসে আছেন, তাদের 'খুশি' করতে পাবলে তো কিছু পেলে, তা না হলে শূন্য হাতে ফিরে যাও। মাল যারা কিনবে তাদেরও নীচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত সবাইকে 'খুশি' করা চাই। বাঁ হাতে কিছু না পড়লে ডান হাত অর্ডার সই কিংবা বিল পাশ করবে না।

মহিম রায়ের মুশকিল হল এতদিনেও ঐ বাঁ হাতের ব্যাপারটা রপ্ত করতে পারলেন না। নীতিগত আপত্তি যে খুব একটা রয়েছে তা নয়, আসলে সাহসের অভাব। কে জানে আবার কোন্ নতুন ফ্যাসাদে পড়তে হবে? বন্ধু বলে থাকেন, ঐটাই তোমার বড় গলদ মহিম। যে যুগেব যে ধারা। তাই বা বলি কেন? এ জিনিস বাপু সব যুগেই ছিল। "দ্বারী হস্তে মুদ্রা দুই চারি" না গছালে দেবদর্শন হত না। রাজদর্শন কি বা রাজানুগ্রহ লাভ করতে হলে আরো ব্যাপক ব্যবস্থা। হাতি-ঘোড়া হীরা-জহরৎ মায় নারী পর্যন্ত। (স্ত্রী-রত্ন কথাটা বোধহয় ওর থেকেই এসে থাকবে।) এটা সব যুগে দেশেই ছিল এবং আছে। তফাৎ শুধু নামে। আমরা বলি ঘুষ, পিতামহরা বলতেন উৎকোচ। ইংরেজদের নামটা বেশ গালভারী—Illegal gratification

ঝোঁকের মাথায় বন্ধু দাশ আজ আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেন। ব্যবসা প্রসঙ্গে কোন একটা সূত্র ধরে বললেন, ভাখ মহিম, কারবার করতে বসে অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। দু-চারটে

মিথ্যা কথা, দরকার মত মাঝে মাঝে দু-একটা ধপ্পাবাজি, কিংবা সাধুভাষায় যাকে বলে প্রতারণা, এগুলো খুব দোষের নয়। কমবেশী সবাই করে থাকে। Honesty is the best policy বলে যে একটা নীতি বাক্য আছে, শুনতে খুব ভাল; কিন্তু স্কুলের পরীক্ষায় essay লেখা ছাড়া আর কোন কাজে লাগে না।

এরপরে যেসব আলোচনা হল তার একমাত্র লক্ষ্য টাকাটা কি করে সংগ্রহ করা যায়। শেষ পর্যন্ত বন্ধু যে প্রস্তাব করলেন, মহিমের মন তাতে সায় দিচ্ছিল না। কতকটা নিমরাজী হলেও ভয় কাটল না এবং শেষরক্ষা হবে কিনা তাতেও সন্দেহ রইল। বললেন, যদি ধরা পড়ে যাও কেলেঙ্কারির একশেষ।

বন্ধুবাবু আশ্বাস দিলেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

টাকাটা সম্বন্ধে প্রতিভারও কম উদ্বেগ ছিল না। সংসারটি নেহাৎ ছোট নয়। তারা দুজন, দুটি মেয়ে একটি ছেলে। বড় ছেলে থেকেও নেই, পায়ে জোর হতেই বৌ ছেলে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে চলে গেছে। সমস্ত ভার বৃদ্ধ স্বামীর একার কাঁধে। সারাজীবন খেটে ঐ কারখানাটা দাঁড় করিয়েছেন। ভালই চলছিল এতদিন। হঠাৎ কী যে হল!

মহিম বাড়ি ফিরতেই জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু সুবিধে হল?

না।

কী করবে ভাবছ?

দেখি।

পরদিন ফ্যাকটরী থেকে ফিরে বললেন, আজ এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম।

জ্যোতিষী! বিস্ময়ের সুর প্রতিভার। এসব ব্যাপারে স্বামীর কোন আস্থা নেই, এটাই দেখে এসেছেন এতদিন।

মহিম বললেন, অনেকের মুখে শুনলাম হাত দেখে যা বলেন

-তা সব নাকি মিলে যায়। ভবিষ্যতে কী হবে তাও বলে দেন।

তুমি হাত দেখিয়েছ?

যা ভিড়, ঢোকাই গেল না। শুনলাম বেশী ফী দিলে বাড়িতে এসেও দেখেন। সেই ব্যবস্থা করে এসেছি। পরশু বেলা ছটোয় সময় দিয়েছে সেক্রেটারী।

কোথায় থাকেন?

শুনলাম তো সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। কলকাতায় এসেছেন দিন পনেরো হল। গ্র্যাণ্ড হোটেলে আছেন।

বড় বড় চোখ করে শুনলেন প্রতিভা। এত বড় জ্যোতিষীর কথা আগে কখনো শোনেননি।

ঠিক ছটোয় ট্যাকসি এসে থামল বাড়ির সামনে। মহিমবাবু ছুটে গেলেন। প্রতিভা আড়াল থেকে দেখলেন, এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নেমে আসছেন গাড়ি থেকে। লম্বা চুল, বিলম্বিত দাড়ি, পরণে রক্ত রঙের আলখাল্লা, হাতে ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে চন্দন তিলক। গোড়াতে ভেবেছিলেন তিনিও একবার বেরোবেন জ্যোতিষীর সামনে, কিন্তু ঐ চেহারা দেখে কেমন যেন সাহস হল না। গভীর সম্ভ্রমভাবে দূর থেকেই প্রণাম করলেন।

বাইরের ঘরে একটা সোফায় এসে বসলেন জ্যোতিষী এবং মহিমবাবুকে ইঙ্গিত করলেন পাশে এসে বসতে। ডান হাতটা টেনে নিয়ে প্রথমে খালি চোখে, পরে রিডিং গ্লাস দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, কপালের দিকেও তাকালেন, তারপর ভাঙা গলায় বললেন, একটা নাটবল্টুর ফ্যাক্টরী আছে আপনার?

আজ্ঞে।

ভাল চলছে না?

আজ্ঞে না।

টাকার সন্ধানে ঘুরছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পাবেন। একমাস তিন দিন পরে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে আপনার হাতে। এক কাজ করুন—

কী, বলুন।

একটা লটারীর টিকিট কিনুন। সাত দিন পরে কিনবেন। তার আগে নয়।

মহিমবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিলেন জ্যোতিষী, হ্যাঁ, আশু প্রয়োজন মেটাবার মত অর্থও পেয়ে যাবেন, আপনার কোন প্রিয়জনের কাছ থেকে। ভয় নেই, বিপদ কেটে যাবে।

কী বলে গেলেন? স্বামী ভিতরে আসাতেই সাগ্রহে জানতে চাইলেন প্রতিভা। জ্যোতিষী যা-যা বলেছেন তার মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে মহিম যোগ করলেন, দূর, ওসব আমার বিশ্বাস হয় না। খালি খালি কতগুলো টাকা নিয়ে গেল।

প্রতিভা কিছুই বললেন না। পাশের ঘরের দরজায় ফাঁক দিয়ে তিনি সবই দেখতে ও শুনতে পেয়েছিলেন। পরদিন সকালে মহিম যখন বেরোবার আয়োজন করছেন, একটা পুঁটলি হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোমার ব্যাগে ভরে নাও। বিক্রী করে, যে দেনাগুলো না দিলেই নয়, মিটিয়ে দাও।

না না, ওসব তুমি রেখে দাও, এই দুর্দিনে ঘরেব গয়না বিক্রি করতে আছে?

তাতে কী হয়েছে? এগুলো তো আজকাল কেউ পরে না। এমনিতেই ভেঙ্গে গড়াতে হত। তা না করে এর বদলে তুমি একসেট হাল ফ্যাসানের নতুন গয়না এনে দিও আমাকে।

সেদিন কি আর এ জীবনে আসবে মনে কর?

নিশ্চয়ই আসবে। কী বলে গেলেন জ্যোতিষী ঠাকুর?

বাড়ি থেকে বেরিয়ে মহিম একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা গিয়ে উঠলেন বন্ধুর বাড়ি। গয়নার খবরটা জানাতেই প্রচণ্ড উল্লাসে

ফেটে পড়লেন বন্ধু দাশ, বল কি! প্রথম কিস্তিতেই মাৎ! ব্যস তাহলে আর মারে কে? লটারীর টিকিটটাও কিনে ফেল।

সত্যিই কিনব?

নিশ্চয়ই। কিনে গিন্নীর কাছে দিয়ে দেবে।

তারপর? রেজাল্ট বেরোলে যখন দেখা যাবে আসলের বেলায় ঢুঢু?

সে তখন দেখা যাবে। হ্যাঁ শোন, কী নাম যেন সেই লোকটার, যার কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিলে?

বংশীলাল।

ব্যাটা কী করে, কোথায় কিসের কারবার, কটা ছেলে, কটা মেয়ে, কোনো অসুখ বিসুখ আছে কিনা এসব কিছু জানো?

না; তবে অসুখের কথাটা না জেনেও বলা যায়। অত টাকা যখন, ডায়েবেটিস আব ব্লাড প্রেশার নির্ঘাৎ থাকবে।

তা যা বলেছ। ও দু'টো ধরে নেওয়া যেতে পারে। না থকলেও লোকে মনে করে—আছে। বাকী যা যা বললাম যোগাড় করবার চেষ্টা কর না।

তোমার মতলবটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ওখানে কোন সুবিধে হবে না। সবাই তো আমার গিন্নী নয়, যে ভেল্‌কি দেখিয়ে ভোলাবে?

কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। তাই বন্ধুবাবু ও পথে না যাওয়াই স্থির করলেন।

লটারীর টিকেটখানা প্রতিভার কাছেই ছিল। 'ড্র' এর তারিখ পেরিয়ে যেতেই স্বামীর হাতে দিলেন এবং ফলটা জেনে আসবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগলেন। মহিমকে বেরোতে হল। যখন ফিরলেন সঙ্গে বন্ধু দাশ। গেট পেরিয়েই হাঁক ডাক শুরু করলেন, কই বৌদি, কোথায় গেলেন? শীগগির আসুন।

স্বামীর এই বন্ধুটির সামনে আগে বড় একটা বেরোননি প্রতিভা। যখনই এসেছেন, শাড়ি পালটে এবং কিছুটা প্রসাধন সেরে নিয়ে তবেই বেরিয়েছেন। আজ আর সে কথা মনে রইল না। একেবারে সাদামাটা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলেন বন্ধু, কী খাওয়াচ্ছেন বলুন। না, শুধু মিষ্টি মুখ করালে চলবে না, রীতিমত ফিষ্টির আয়োজন করুন।

সারা বাড়িময় সাড়া পড়ে গেল। মেয়েরা ও ছেলে এসে জড়িয়ে ধরল বাবাকে। চাকর-বাকর যে যেখানে ছিল সব কাজ ফেলে জড়ো হল বাইরের ঘরে। যে-সে ব্যাপার নয় —রাজস্থান স্টেট লটারীর ফার্স্ট প্রাইজ। পুরো একলাখ টাকা।

বড় মেয়ে বলল, আমাকে কিন্তু পরীক্ষার পরে বিলেত পাঠাতে হবে বাপি, দাদাকে যেমন পাঠিয়েছিলে।

মেজ মেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, দূর, এখন আবার কেউ বিলেত যায় নাকি? আমি যাব কন্টিনেন্ট, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান নাচ শিখব। টাকাটা কিন্তু এখন থেকেই আলাদা করে রেখ, বাপি। হুঁ, শেষে যে বলবে—

ছেলে স্কুলে যায়। তার দাবি আপাতত একটা টু-সীটার গাড়ি।

স্ত্রীর মুখে কোন কথা সরল না। অভিভূত হয়ে বসে রইলেন। দু-চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল আনন্দধারা। মহিমও হাসি মুখে চুপ করে রইলেন। বন্ধুই তাঁর হয়ে ছেলেমেয়েদের আশ্বাস দিলেন, হবে হবে সব হবে। ঝি চাকরদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরাও পাবে। তোমাদের মনিব কাউকে অখুশী রাখবে না।

পরদিনই বংশীলাল এসে হাজির। বন্ধুবাবুর কাছে খবর পেয়ে আর দেরি করেননি। গেটের বাইরে থেকেই মোটা গলার চিৎকার, আরে, কোরেছেন কী মোশাই, একেবারে কেল্লা ফতে!

বংশীলাল বিবেচক ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। প্রাইজের টাকাটা

পেতে কিছুটা তো দেরি হবে, তাই কয়েক বাণ্ডিল নোট একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। মহিম যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে কিছু বেশীই এনেছেন, যাতে করে সব দিকের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে কারখানাটা এখন থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারে। হ্যাণ্ডনোট দিতে যাচ্ছিলেন মহিমবাবু। বংশীলাল দু-হাত তুলে বলে উঠলেন, আরে না না। হ্যাণ্ডনোট কী হবে? এ টাকা আপনার কাছে থাকাও যা আমার আছে থাকাও তা।

যাবার আগে চুপি চুপি বলে গেলেন সুদের হারটা যেন ডবল করে দেওয়া হয়। তাতে আর অসুবিধা কী, অতগুলো টাকা যখন মুফৎ এসে যাচ্ছে হাতের মধ্যে?

দিন তিনেক বাদে আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। বড় ছেলের গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে। কতকাল পরে, মহিম মনে করতে পারলেন না। সঙ্গে স্ত্রী এবং ছেলে। চারদিকে মালিন্যের ছাপ, পড়ন্ত অবস্থার লক্ষণ। দেখে বারবার অনুযোগ দিল মাকে, এই রকম হাল হয়েছে বাড়িঘরের, আমাকে তো একবার জানালেও পারতে।

একবার নয়, অনেকবারই জানানো হয়েছিল, মা আর সে কথা তুললেন না। তখনই বন্দোবস্ত হয়ে গেল,আসছে সপ্তাহেই মিস্ত্রী লাগবে বাড়িতে। দরজা জানালা গ্রীল দেওয়াল সব আগাগোড়া রং করা হবে, পালিশ পড়বে ফার্ণিচারে, পাল্টে যাবে ঐ মান্ধাতার আমলের সোফা সেটী, ছেঁড়া ময়লা পরদাগুলোও থাকবে না।

সে যে অনেক টাকার ব্যাপার, বললেন প্রতিভা।

ছেলে উত্তর দিল, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

একফাঁকে শাশুড়ীকে আলাদা ভাবে অন্য ঘরে ডেকে নিয়ে গেল বৌমা। কথায় কথায় জানাল, পার্ক স্ট্রীটে একটা নতুন চেম্বার খোলার কথা চলছে। ঘর পাওয়া যাচ্ছে, তবে সেলামিই লাগবে পনর হাজার টাকা। তার উপরে অন্যান্য খরচ তো আছেই।

সেগুলো না হয় একরকম করে যোগাড় করা যাবে। কিন্তু ঐ সেলামিটা—

প্রতিভা আশ্বাস দিলেন, ঠিক আছে, তার জন্যে আটকাবে না। ঘরটা নিয়ে নিতে বল।

প্রাইজের লিস্ট বেরিয়ে গেছে বেশ কিছুদিন। টাকাটা পাবার সময় হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু মহিম এতদিন সময় করে উঠতে পারেন নি। কারখানাটা ঢেলে সাজানো হয়েছে, পুরোদমে কাজ চলছে। তাই নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। এর মধ্যে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে দু-চারবার তাগিদ এসে গেছে। আর দেরি করা চলে না। পুরুত ঠাকুরকে দিয়ে একটা ভাল দিনও দেখিয়ে রেখেছিলেন প্রতিভা। সেই দিনই টিকিটখানা ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়লেন মহিম। পিছন থেকে শুনতে পেলেন,—মৃদুকণ্ঠের— দুর্গা, দুর্গা।

প্রথমে গেলেন ফ্যাক্টরীতে, সেখান থেকে বন্ধুর বাড়ি।

বন্ধুবাবু জানতে চাইলেন, কাজকর্ম কি রকম চলছে ?

মহিম বললেন, ভাল। কিন্তু—

আবার কিন্তু কী—

না, মানে একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে—

তাতে কি হয়েছে? বাধা দিয়ে বললেন বন্ধুবাবু, End justifies the means. কাজ হওয়া নিয়ে কথা; তা যে করেই হোক। তাছাড়া আমরা তো কারো ক্ষতি করিনি।

ঠকিয়েছি তো।

একে ঠকানো বলে না। তোমার ফ্যাক্টরী যখন দাঁড়িয়ে গেছে বংশীলালের টাকা তুমি দিয়ে দিতে পারবে, স্ত্রী ছেলেমেয়েরাও অভাবে পড়বে না। গিন্নীর গয়না ? সে তো সারাজীবনের দায়। না নিলেও দিতে হত।

যাক ওসব কথা। এবার শেষটা সামলাই কেমন করে তাই বল।

তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি তোমার কাজে চলে যাও। ঐ ব্যাগটা শুধু রেখে যাও আমার কাছে। ওটার মায়া তোমাকে ছাড়তে হবে। ভেতরের কাগজ পত্তর সব নিয়ে যেতে পারো।

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। মহিমের তখনো দেখা নেই। ভীষণ উৎকণ্ঠায় ঘর-বার করছিলেন প্রতিভা। বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ হতে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে নেমে আসছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মুখের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠলেন প্রতিভা। অস্ফুট স্বরে বললেন, কী হয়েছে!

চলুন, বলছি।

বাইরের ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন বঙ্কুবাবু। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, মহিম যখন ট্যাক্সি থেকে নেমে লটারী অফিসের দিকে যাচ্ছিল, দুটো ষণ্ডামতন লোক এসে হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।...তার মধ্যে ওর টিকিটটা ছিল। পুলিশের অবিশ্যি খবর দেওয়া আছে। তবে—

বাকীটুকু না বললেও বুঝতে অসুবিধা হল না। পুলিশ আর কী করবে।

প্রতিভা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। মেয়েদুটিও ঘরে এসে ঢুকেছিল। নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালের ধারে।

এর আর কোন উপায় নেই? অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললেন প্রতিভা।

না, টিকিট যে দেখাবে সে-ই টাকাটা পাবে।

উনি কোথায়?

আমার ওখানে। এল না। বলল, কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াব সকলের সামনে?

লাভের গুড়

কাল থেকে পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। মোটমাট পাঁচ দিন। একে সওদাগরী অফিস, তায় খাস ব্রিটিশ। এইটুকু দাক্ষিণ্য যে দেখিয়েছে, সেই ঢের। একেবারে না দিলেই বা কী করতে পারতাম ?

কথাটা শুনে আজকের পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। তাই বলে রাখি, ঘটনাটা ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার। এখন হলে বলতাম —কী না করতে পারতাম !

শেয়ালদা থেকে বনগাঁর প্রথম গাড়ি ছাড়ে বলতে গেলে শেষ রাতে। ওটাতে বোধ হয় হ'য়ে উঠবে না। তার পরেরটা অবশ্যই ধরতে হবে। পাঁচদিনের পাঁচটা মিনিটই বা মেস্‌এ বসে নষ্ট করি কেন ? সুতরাং বড়মামার সঙ্গে দেখা করার পালাটা আজই সেরে রাখতে হয়। ডালহৌসী থেকে উত্তরের ট্রাম না ধরে দক্ষিণ-মুখী হলাম।

ভবানীপুরের বাসায় ঢুকতেই মামাতো ভাই নন্তুর সঙ্গে দেখা। গম্ভীরভাবে বলল—এই যে ছোড়দা এসে গ্যাছ ? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

'কী ব্যাপার ?'

'বসো, আসছি।'

একটু ভাবনা হল। কোনো গোলমেলে খবর হবে নিশ্চয়ই। নন্তু এল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। হাতে কাপড় ঢাকা দেওয়া কী একটা জিনিস। আমার পাশে রেখে ঢাকাটা তুলেই হেসে উঠল। সত্যই তাক লাগিয়ে দিয়েছে নন্তু। বলল—অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি তোমার জন্যে।

আমি পরম স্নেহে জিনিসটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম—'অ্যালসেশিয়ান বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে মানে? একেবারে হাণ্ড্রেড্ পারসেণ্ট্ পিওর। ক্রস্ ব্রীড্ ক্রীড্ নয়। ক্রীপ্ সাহেবের মালীকে নগদ দশটি টাকা ঘুষ দিয়ে তবে বের করতে পেরেছি। সাহেব জানে না। তাকে বলেছে—বাচ্চাটা মরে গ্যাছে, সায়েব।'

একটি অ্যালসেশিয়ানের স্বপ্ন আমার অনেক দিনেব। আমাব চেয়েও বেশী, ছোট বোন তরুর। যখনই বাড়ি যাই তার প্রথম কথা হল, আমার কুকুর? অন্য কোনো জাত হলে চলবে না। অ্যালসেশিয়ান। অনেক চেষ্টা করেছি। হাতিবাগানের বাজারে পেয়েছিলাম দু একটা। দাম যা হাঁকল, শুনে চক্ষু স্থির। মাত্র দশটি টাকায় এ জিনিস! কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিল আজ!

পূজোয় বাড়ি যাওয়া মানে অনেক ঝামেলা। কাপড় জামাব সঙ্গে টুকটাক অনেক জিনিস জড়ো হ'ল। পাশের বাড়ির ঘোষাল-দাদুর ফরমাস ছিল এক ঝুড়ি কড়া পাক। মফঃস্বলেব নরম নরম সন্দেশ তাঁর পছন্দ নয়। ভীম নাগ থেকে নিতে বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বাড়ির জন্যেও কিছু নিতে হ'ল! মিষ্টিই হ'ল গোটা পনেরো টাকার। তার মানে এখনকার প্রায় পঞ্চাশ টাকা।

ষ্টেশনে যখন পৌছলাম, গাড়ি ছাড়তে মিনিট দশেক বাকি। কুকুর তো বুক্ না করে নেওয়া চলে না, হলই বা বাচ্চা। ভীষণ কড়াকড়ি তখন রেলের। রাস্তায় ক্রু ব উৎপাত আছে। ধরতে পারলে ভাড়া তো নেবেই, তার উপরে মোটা টাকা পেনালটি আদায় করে ছাড়বে। এখনকার আমল তো নয়, যে সহযাত্রীদের সাহায্য পাবো। ভাড়া চাইলে ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে ক্রু বাবাজীকে! এত সুখ ছিল না তখন। পরাধীন দেশ তো। আইন মেনে চলতে হত।

পূজোর ভিড়। অত কম সময়ে কুকুর বুক করা অসম্ভব। যা থাকে কপালে বলে উঠে পড়লাম। বসাবার জায়গা নেই। হাতের বাচ্চাটির দিকে নজর পড়তে, এক ভদ্রলোক তাঁর পাশে একটু জায়গা ক'রে দিলেন। অর্থাৎ কুকুরের কল্যাণে বসতে পেলাম।

বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে তার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। দেখলাম, ভদ্রলোক আমারই মতো কুকুর-পাগল, এবং তার উপরে এদের জাতধর্ম-বিষয়ে জানেনও অনেক কিছু। অর্থাৎ যাকে বলে সারমেয়-তত্ত্বে সুপণ্ডিত। এক ফাঁকে দামটা জানতে চাইলেন। আমি তো আর বলতে পারি না, এটি চোরাই মাল কিংবা ঘুষের সংগ্রহ। বললাম—'পঁচিশ টাকা নিয়েছে।' 'খুব সস্তায় পেয়েছেন, যাকে বলে দাঁও মারা। আসল অ্যালসেশিয়ান। খাইয়ে দাইয়ে ঠিক মতো মানুষ করতে পারলে এই কুকুর আপনার বাঘের কাজ দেবে।'

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল! একটা কোনো স্টেশনে গাড়ি আসতেই কামরার ওধারে ক্রুর দর্শন পাওয়া গেল। ভদ্রলোক আমার চোখ মুখের অবস্থা দেখেই বোধহয় ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। বললেন—'দিন ওকে আমার কাছে।' বাচ্চাকে জামার তলায় লুকিয়ে ঢুকে পড়লেন বাথ্‌রুমে। পরের স্টেশনে গাড়ি থামবার পর আরো খানিকটা সময় নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ক্রু তখন চলে গেছে। আমি বললাম—'খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি।' স্বভাবতই আমার সুরে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। তিনি বললেন—ও কিছু না। এখনো কিন্তু আমাদের বিপদ কাটে নি। ক্রুর ওপরে আবার সর্দার-ক্রু আছে, ক্রু-ইন্‌-চার্জ। সে ব্যাটা যেখানে সেখানে উঠে সারপ্রাইজ চেক্ করে। এক কাজ করা যাক। আমার পকেটে চকোলেট ছিল। খাইয়েছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শীগগির আর সাড়া শব্দ দেবে না। ওপরে তুলে দিই।

ভদ্রলোকের জিনিস পত্র ছিল বাঙ্কের একেবারে কোণের দিকে, তারপরেই আমার মাল। ওরই কোন একটা ফাঁকে বাচ্চাকে ঢুকিয়ে দিলেন। চমৎকার গল্প জমাতে পারেন ভদ্রলোক। দেখতে দেখতে সময় কেটে গেল। গোবরডাঙ্গা ছাড়িয়ে একটা কি ছোট স্টেশনে আসতেই তিনি উঠে পড়ে বললেন—আমি এবার নামবো। আপনার বাচ্চা দেখে নিন।

হেসে বলল—গোড়াতে আমার ছিল, এখন ওটা আপনার বাচ্চা। ওর জন্যে যা কাণ্ড করতে হয়েছে আপনাকে—

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। আশেপাশে যারা ছিল, তাদের মুখেও হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল। অর্থাৎ কথাটা সকলেই উপভোগ করল। উনি কুলী ডেকে মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন।

বারাসতে পৌঁছে খুচরো জিনিসগুলো নিচে নামাতে গিয়ে দেখি বাচ্চাটা তো নেই। কোথায় গেল? কোনো বাক্স বিছানার আড়ালে ঢুকে গেছে হয়তো। সারা বাঙ্ক খালি হয়ে গেল! নেই তো নেই। আশেপাশের চোখগুলোয় এবারেও হাসি-হাসিভাব লক্ষ করলাম। অর্থাৎ এটাও সকলে উপভোগ করছে।

মিষ্টির ঝুড়িটা নামাতেই টের পেলাম, অত সাধের অ্যালসেশিয়ান মাঝপথে চলে গেলেও প্রভুকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে নি। কিঞ্চিৎ স্মৃতি রেখে গেছে। 'ভীমনাগ'এর মধুরগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঝুড়ির উপর কখন চড়ে বসেছিল। স্বাদ নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, কড়াপাকের সন্দেশগুলোকে সরস ক'রে দিয়ে গেছে।

মিনিট কুড়ি কেটে গেল। প্রফেসরের দেখা নেই। মেয়েরা দলে দলে গোল হয়ে, কেউ বেঞ্চে বা হাইবেঞ্চে বসে, কেউ পাশে দাঁড়িয়ে তুমুল আড্ডা জমিয়ে তুলেছে। চারদিক থেকে নানা কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে দুটি শব্দ—'এই, শোন্'—এদের যেটা চিরন্তন রীতি।

পৃথিবীতে দুটি জাত আছে, নারী ও পলিটিশিয়ান, যারা শুধু শোনাবে, শুনবে না।

এই মুহূর্তে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। একটি মেয়ে গিয়েছিল আফিসে খবর আনতে। ফিরে এসে অধ্যাপকের মঞ্চে উপর চড়ে তীক্ষ্নস্বরে জানিয়ে দিল, জেম আসছেন না। সঙ্গে সঙ্গে সব কলরব বন্ধ। যে যেখানে ছিল হুড়মুড় করে গিয়ে ঘিরে ধরল তাকে। সবগুলো চোখ ঔৎসুক্যে উজ্জ্বল-কি ব্যাপার বল তো?

ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ—মেয়েটির চোখের কোণে ঠোঁটের বাঁকে চাপা হাসি। তার মধ্যে রহস্যময় ইঙ্গিত। শুধু ইঙ্গিতে খুশী হবার মত মনের অবস্থা তখন কারুর নয়। সে-ও বোধহয় নিজেকে আর একটু ব্যক্ত করবার জন্যে উৎসুক। বলল, বি কে সি'র সঙ্গে সেই যে একটা—কী বলব?

কে একজন বলে উঠল, ড্যাশ্!

এক পশলা হাসির ঝঙ্কার।

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। সেই ড্যাশ্‌টা উঠে গেল আর কী! কাজেই জেম্ আর আসছেন না।

সেই সুরসিকার কণ্ঠ আবার শোনা গেল, "অর্থাৎ ফিল্ আপ্ দি গ্যাপ্-এর কোয়েশ্চেনটায় পুরো নম্বর পেলেন জনাদি।"

জনা-মজুমদার। সংক্ষেপে জে. এম্।

মেয়েরা তাকে আরো সংক্ষেপ করে নিয়েছিল জেম্। নামকরণটা অর্থহীন নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিল জনা। তাছাড়া

চেহারায় সাজপোশাকে, চলনে বলনে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য ছিল যে তার রীতিমত রূপসী ছাত্রীরাও এই তরুণী অধ্যাপিকাকে ঈর্ষার চোখে না দেখে পারত না। তার তুলনায় বি. কে. সি. অর্থাৎ বাংলার অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র কিশোর চন্দ নেহাৎ ম্যাড়মেড়ে। এই দুটি নামের মাঝখানে একটি যোগচিহ্ন বসিয়ে সিঁড়িতে করিডোরে, কমন রুমে পিছনের বেঞ্চিতে যেদিন গোপন কানা-ঘুষা শুরু হল এবং সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য আলোচনার স্তরে গিয়ে পৌঁছল, অনেকেই বিশ্বাস করতে চায়নি। বি. কে. সি-র মধ্যে কী দেখল জেম্!

এবারে অবাক হয়ে গেল। কেউ কেউ নাক সেঁটকাল। কারো কারো চোখ উঠল কপালে। কিন্তু অনেকেই খুশী হল। সংসারে সুখ-সমাপ্তিই বেশির ভাগ মানুষের কাম্য। অলস্ ওয়েল দ্যাট্ এণ্ডস ওয়েল।

আর ক্লাস নেই। হৈ-চৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল মেয়েরা? কেউ কেউ চলল নীরবে, পা দুটিও মন্থর। যেতে যেতে হয়তো একটু ম্লান ছায়া ঘনিয়ে এল মনের কোণে। তাদের জীবনে জেম্-এর মত একটি 'ড্যাশ'-এর আবির্ভাব ঘটে থাকবে। কে জানে কেমন করে ভরতি হবে সে ফাঁকটুকু? হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? যদি হয়, যে শব্দটি সেখানে বসাতে চেয়েছিল সেটি হয়তো বসানো যাবো না, যে-কোনো একটিকে বসিয়ে দায় চুকিয়ে ফেলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের চেয়ে জীবনের প্রশ্ন অনেক বেশী অনিশ্চিত!

কলেজের ঠিক সামনেই বাস-স্টপ। অন্যদিন সেখান থেকেই উঠে পড়ে দীপালী। আরো অনেক মেয়ে ওঠে। আজ বন্ধুদের ভিড়টা এড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল ফুটপাথ ধরে। নিতান্ত অবান্তর এবং অভাবিত একটা দৃশ্য মনের মধ্যে আনাগোনা করছিল, যার জন্যে একটু একা থাকবার প্রয়োজন।

দিন কয়েক আগেকার ঘটনা। শেয়ালদার মোড়ে বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে দীপালীকে রোজ নর্থ স্টেশনে বিরাটীর গাড়ি

ধরতে হয়। ওদিন এ-পারের ফুটপাথ দিয়ে ফলের দোকানগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বাবা আরেক দফা জ্বর থেকে উঠছেন। ভীষণ অরুচি। কদিন থেকে বলছিলেন, একটু আমসত্ব পেলে তাই দিয়ে দুটো ভাত খেতে পারেন। মা শুনেও চুপ করে ছিলেন। সংসারের যা অবস্থা, ঐ বাড়িতে কয়েক আনা পয়সা খরচ করতে গেলে অনেক জায়গায় টান পড়ে। কোথায় হাত দেবেন বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ফয়সালাটা দীপালীই করে ফেলল। অনেকটা আপনা থেকে হয়ে গেল, বলা চলে।

পর পর দুদিন বাস কণ্ডাকটর ভাড়া চাইতে এল না। ভিড়ের চাপে আসতে পারল না তার কাছে। গোটাকয়েক পয়সা বাঁচল, কিন্তু মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করতে লাগল। ভাড়াটা তার দেয়। নিজে গিয়ে যেচে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাবে কেমন করে? সেখানেও তো ঐ ভিড়ের প্রশ্ন। তবু খানিকটা কষ্ট করলে হয়তো হাত বাড়িয়ে দেওয়া যেত পয়সাটা, অন্ততঃ চেঁচিয়ে বলতে পারত, টিকেট দিন। কী দায় পড়েছে তার? নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল দীপালী। ভাড়া আদায় করা ওদের দায়িত্ব। ওরা যদি তা পালন না করে, সে কেন গায়ে পড়ে অত কষ্ট করতে যাবে? তাছাড়া অনেকেই তো দেয় না, ইচ্ছা করে গা-ঢাকা দেয়, দিচ্ছি, দিচ্ছি বলে নেমে পড়ে। তার কলেজের মেয়েরাও আছে সেই দলে। তবে তারই বা এমন মনখারাপ করবার কী আছে? এ যুগে অত নীতিবাগীশ হওয়া চলে না।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই টিকেট ফাঁকি দেয় দীপালী। যখনই দেয়, মনের একটা কোন খুঁত খুঁত করতে থাকে।

পরক্ষণেই আরেকটা দিক এসে তাকে থামিয়ে দেয়।

এমনি করে কিছু পয়সা জমল। বাবার আমসত্বের ব্যবস্থা হল।

প্যাকেটটা হাত-ব্যাগে পুরে রাস্তা পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দীপালী।

ফুটপাথের অনেকখানি জুড়ে নানারকমের সওদা সাজিয়ে ফেরিওয়ালার নানা সুরে চিৎকার করছে। হঠাৎ কানে গেল একটা অন্যধরনের সুর। অনেকটা নীচু, যেন চেঁচাতে অভ্যস্ত নয় লোকটি, হয়তো সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছে না 'ভালো ব্লাউজ আছে নেবেন? তাছাড়া ছেলেদের প্যাণ্ট, মেয়েদের ফ্রক—'

দীপালী চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকাল। কথাগুলো তার উদ্দেশ্যে নয়। তার একটু পিছনে একজন প্রৌঢ়া মহিলা আসছিলেন। তাব দিকে চেয়ে বলছিল লোকটি। এ স্বর যে তার অনেক কালের চেনা। শুধু কি স্বর, মানুষটা আরো বেশী। কিন্তু অনেক বদলে গেছে। না যদি চিনত, নিজেকে দোষ দিতে পারত না।

কানুদা। তাদেরই গ্রামেব (এখন আর তাদের নেই, চিরকালের তরে হাবিয়ে গেছে) পূব পাড়ার বোসেদের বাড়ির বড়ছেলে। জম-জমাট অবস্থা ছিল। সবাই বলত বডবাড়ি। লতায় পাতায় জড়ানো কি একটা সম্পর্ক ছিল দীপালীদের সঙ্গে। কানুদার বাবা সেটা স্বীকার করতেন না। ও করত। সেই সুবাদে মাঝে মাঝে আসত তাদের বাড়ি। বাইরে থেকে দরাজ গলায় 'খুড়িমা' বলে এক হাঁক দিয়েই ভিতরে চলে আসত। মা খুব খুশী হতেন। বাবা বাড়ি থাকলে সস্নেহ সমাদরে ডেকে নিয়ে বসাতেন। দীপালীর তখনকার মনেও এক ঝলক হঠাৎ খুশি ছড়িয়ে পড়ত। সেই সঙ্গে বুকের ভিতরটা দুর দুর করে উঠত। কাছে যেতে ইচ্ছা করত, কিন্তু পা দুটো যেন কিছুতেই চলতে চাইত না। মা ডেকে পাঠাতেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াত।

কানুদা তখন ঢাকায় পড়ে। আসছে বছর বি. এ. দেবে। কত গল্প করত কলেজের, হস্টেলের, আরো নানা জায়গার, নানা বিষয়ের। খেলা-ধূলাতেও মস্ত নাম-ডাক ছিল কানু বোসের। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি স্বাস্থ্য। কত ভক্ত তার। ছেলে, মেয়ে দুইই। দীপালীর চৌদ্দ বছরের জীবনে অতি অনায়াসে বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল কানুদা। তাকে ঘিরে বাবা-মার মনেও যে একটি ভীরু

আকাঙ্খা অঙ্কুরিত হয়েছিল, কিন্তু বোসেদের ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে মাথা তুলতে সাহস করেনি, সে খবরও জানত দীপালী।

তারপর এল সাতচল্লিশের সর্বনাশ। জন্ম জন্ম ধরে যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন, সেই মাটি যেন রাতারাতি পায়ের তলা থেকে সরে গেল। শুধু একা দীপালীদের নয়, তাদের মত লক্ষ লক্ষ নরনারীর। তবু আরো তিনটা বছর নানারকম লাঞ্ছনা সয়ে কোনরকমে ভিটে আঁকড়ে পড়েছিলেন ভবনাথ পাল। পঞ্চাশের ধাক্কা যখন এল, আর পারলেন না। মেয়েটাকে নিয়েই বেশী ভাবনা। একদিন রাত্রির অন্ধকারে স্ত্রী-কন্যা এবং দুটি শিশুপুত্রের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন 'বর্ডার'-নামক এক অজানা, অনিশ্চিত লক্ষ্যের উদ্দেশে।

তার আগে বড় বাড়ির বড়কর্তা জগৎ বোসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, আপনিও চলুন দাদা, আর থাকা ঠিক নয়। কথাটা তিনি তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, তিনখানা গাঁয়ের সব মিঞার টিকি, থুড়ি, দাড়ি এই হাতে বাঁধা। আসুক না দেখি, কার কত বড় বুকের পাটা।

ভবনাথ অত সাহস করলেন না। প্রতিবেশী মুসলমানেরা কোন ভরসা দিতে পারল না। কেউ কেউ বরং বলল, আর দেরি করবেন না পালমশাই, আমরা আপনাদের বাঁচাতে পারব না।

দীপালীরা চলে এল। টাকাকড়ি সামান্য যা সঙ্গে আনতে পেরেছিল, সারা পথে ছড়াতে ছড়াতে আসতে হল। তা না হলে মান-প্রাণ নিয়ে এপারে এসে পৌছতে পারত না।

আসবার সময় কানুদার সঙ্গে দেখা হল না। সে তখন ঢাকায়। তারপরেও অনেকদিন তাদের খবর পায়নি। এই মাস কয়েক আগে কে যেন বলছিল তার বাবাকে, ওদের চলে আসবার মাসখানেক পরেই জগৎ বোসকে খুন করে টাকা-কড়ি জিনিস-পত্তর সব লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল গুণ্ডারা। বাড়ির লোকেরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে বলতে পারল না।

আরেকবার পিছনের দিকে চোখ ফেরাল দীপালী। ভিড়ের আড়াল থেকে ভালো করে দেখল। কোথায় গেছে সে রঙ? সারা মুখখানা রোদে পোড়া, কণ্ঠার হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, চোখের সে জ্যোতি নেই। যেন কত বয়স হয়ে গেছে এই ক'টা বছরের মধ্যে।

একবার ইচ্ছা হল দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ওর সামনে। কিন্তু যদি চিনতে না পারে। সামনে দিয়েই তো এল। চিনল কই? একটু অভিমান হল। পরক্ষণেই সেটা ঠেলে সরিয়ে দিল দীপালী। ছিঃ ছিঃ, কী ছোট মন তার! কানুদা তাকে চিনবে না? 'দীপু'কে ভুলে যাবে? তাই কখনো সম্ভব? কত মেয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ করে একজনকে লক্ষ্য করে নি। করার কথাও নয়।

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে আবার সামনের দিকেই পা চালিয়ে দিল। ফিরে যাওয়া হল না। লজ্জায় পড়বে কানুদা। কোথায় ছিল আর কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। হয়তো মনে মনে বিরক্ত হবে, যেমন অনেকেই হয়, বিশেষ করে তাদের আত্মীয়-স্বজন। আজকের দুঃস্থ রূপটা আপনজনের কাছে ব্যক্ত হোক, এটা কিছুতেই সইতে পারে না। দেখা হলেই 'কি ছিল' তাই নিয়ে মিথ্যা দম্ভ, 'কী হয়েছে' তাকে ঢেকে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা। কানুদাও কি তাই করবে; কে জানে? মানুষ বড় বদলায়। বাইরের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরটাও। জীবনের শ্রী যখন চলে যায়, মনের উপরেও সেই মালিন্যের ছাপ পড়ে।

তাছাড়া, কী হবে দেখা করে? —যেতে যেতে নিজের মনকে বোঝাল দীপালী, তাতে আজ কোন তরফের লাভ নেই!

ট্রেনে উঠে ভাগ্যক্রমে একটা কোণ জুটে গেল। চোখের উপর রইল মাঠঘাট, গাছপালা, বাড়ি-ঘর, আর মন জুড়ে রইল ফুটপাথে ফেলে আসা সামান্য একটা দৃশ্য এবং তাকে ঘিরে কতদিনের কত কথা!

আসবার দিন যদি থাকত কানুদা। হয়তো তাদের সঙ্গে চলে

আসত। একটি অসহায় বুড়োমানুষের সঙ্গে অতবড় বিপদের মুখে তাদের ছেড়ে দিত না।

বিপদ কি শুধু ওপারে? এপারে পৌঁছেও কত ঝড় গেছে তাদের উপর দিয়ে। কত লাঞ্ছনা, কত গ্লানি। কত অভিশাপ।

ধুবুলিয়া ক্যাম্পের সেই দিনগুলো মনে পড়লে সারা শরীর পাক দিয়ে ওঠে। সবে পনেরোয় পা দিয়েছে তখন। স্বপ্ন দেখবার বয়স। ছচোখ মেলে যা দেখবে, সব রঙীন, রমনীয়। তার জায়গায় কী দেখে এল, মানুষের কি বীভৎস রূপ, জীবনের কি কুৎসিত ছবি। আঘাতে আঘাতে সব স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। চূর্ণ হয়ে গেল সব বিশ্বাস, সব শ্রদ্ধা।

অথচ লোকগুলো যখন এল, ঠিক এল নয়, দলে দলে শিশু থেকে বুড়ো নানা বয়সী মেয়ে-পুরুষগুলোকে কারা যেন বাক্স প্যাঁটরার মত গাদা করে এনে ফেলল একটা বিশাল রোদে-পোড়ো মাঠের মধ্যে, গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট খুপরির গর্ভে, যার নাম রিফিউজি ক্যাম্প, তখনো তারা বাইরের যাই হোক, মনের দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে যায় নি। শ্রদ্ধা প্রীতি, স্নেহ মমতা, একের প্রতি অন্যের সমবেদনা, লজ্জা সংকোচ, আব্রু, সংযম, ন্যায়-অন্যায় বোধ—সমাজ ও সভ্যতার যা কিছু মৌলিক উপাদান, সবই তাদের ছিল। এখানে বসে বসে দেখতে দেখতে সব হারিয়ে ফেলল। কি ভয়াবহ সে বিবর্তন! পরিবেশের এমন প্রচণ্ড শক্তি, মনুষ্যত্বের সর্বশেষ বিন্দু-টুকুও যেন নিংড়ে বের করে নিল অতগুলো নরনারীর বুকের ভিতর থেকে। কেউ আর মানুষ রইল না।

দীপালীর বয়স তখন পঞ্জিকার মাপে পনেরো, কিন্তু অভিজ্ঞতার খাতায় অনেক বেশী। সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, তার চারদিকে একদল নখী, দন্তী, শৃঙ্গী অহরহ উদরের ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছলে বলে কৌশলে ছুটি অন্ন-সংগ্রহ। তার জন্যে কে কাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে, যেখানে নামতে হয় নামবে। ক্ষুধা। ক্ষুধাই একমাত্র চরম সত্য জীবনে। আর তার সঙ্গে জড়ানো—মনে

আসতেও সারা দেহ কুঁচকে ওঠে দীপালীর—সেও আরেক রকমের ক্ষুধা। আরো ভয়াবহ, লজ্জাহীন, আব্রুহীন,বাছবিচারহীন।

তার কবলে পড়ে কত ফুলের মত মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আজও তাদেব কারো কারো সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কলকাত.র জনারণ্যে। বাইরেটা দেখে বোঝা যাবে না, কিন্তু দীপালী জানে ভিতরে ভিতরে এখনো তারা সেই অভিশাপের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে ওখানে একবার নামলে আর কূলে ওঠা যায় না। সবাই কি বাধ্য হয়ে নেমেছিল? কেবল মাত্র অবস্থার বিপাকে পড়ে? না। কেউ যে স্বেচ্ছায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, এই কঠোব সত্যটা অস্বীকাব করবার উপায় নেই। দীপালী জানে। কিন্তু কি ছিল তার পিছনে, প্রলোভন, না প্রবৃত্তিব তাড়না, কিংবা অন্য কিছু, তার জানা নেই।

দীপালীও হয়তো একদিন ওদের দলে গিয়ে ভিড়ত। হাতে-খড়ি তো ওখান থেকে হয়ে গিয়েছিল। সেই মেঘে ঢাকা বিকেলটা যদি মুছে ফেলা যেত জীবন থেকে! কিছুতেই তা হয না। উঠতে বসতে যখন তখন সে সামনে এসে দাঁড়ায়, গাঢ় ছায়া ফেলে ঢেকে দেয় অনাগত দিনের সমস্ত আলো।

তখন সবে এসেছে ক্যাম্পে। পাশের ঘরের একটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল। রোজ বিকেলে তার এক দাদার সঙ্গে বেড়াতে যেত। একদিন বলল, যাবি? চল না একটু ঘুরে আসবি। দীপালী বলেছিল, না; মা বকবে।

—আচ্ছা, আমি বলছি মাসিমাকে।

দীপালীর মা মেয়েকে চোখে চোখে রাখতেন। কখনো বেরোতে দিতেন না। সেদিন বোধহয় মায়া হল। সারা দিন-রাত একটা ছোট্ট গুদামেব মধ্যে বন্ধ থেকে থেকে এরই মধ্যে আধখানা হয়ে গেছে মেয়েটা। বললেন, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এস।

মা মনে করেছিলেন, প্রকাশ্য দিনের আলোয়, চারিদিকে এত লোক গিজগিজ করছে, ভয় কিসের? তিনি জানতেন না, গভীর অরণ্যে যেমন দিন আর রাত বলে কিছু নেই, সেখানকার অধিবাসীরা

বাধা-বন্ধহীন, সকলের সামনে সব কিছু করতে পারে, এই ধুবুলিয়ার মাঠের মানুষগুলোও তেমনি বনচারী পশুর মত বন্ধন-মুক্ত। লোক-লজ্জার অন্তরালটুকুও চলে গেছে। দীপালীও কি ভাবতে পেরেছিল সে কথা?

সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছিল ঠিক, কিন্তু চরম অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাধা দিতে গিয়ে দেখল চারদিকে চোখে সেটা অতি বেমানান, হাস্যকর।

মা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করলে পাছে নগ্ন সত্যটা সাপের মত বেরিয়ে পড়ে, তাই বোধহয় তাকে ঝাঁপিয়ে মধ্যেই থাকতে দিয়েছিলেন। সেদিন থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন, ওখান থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়া যায়।

বিরাটীর এই জবর-দখল কালোনীর সন্ধান যেদিন এল, ক্যাম্পের কয়েকজন লোক গোপনে খবর নিয়ে এল ভবনাথের কাছে, তিনি প্রলুব্ধ হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে পারলেন না। ঐ 'জবর' কথাটায় বাধল। জোর করে পরের জমি দখল করবেন? মাস্টার মানুষের মন সায় দিল না। কিন্তু দীপালীর মা-র মনে এতটুকু দ্বিধা দেখা দিল না। তাতে কী হয়েছে? এত লোক যাচ্ছে।

ভবনাথ অন্য যুক্তি পাড়লেন, পরে যদি বিপদে পড়তে হয়? মালিক এসে জোর করে তুলে দেয়?

—সে তখন দেখা যাবে।

বিপদ সত্যিই এসেছিল। একবার লাঠিসোঁটা নিয়ে মালিকের লোক, আরেকবার পুলিশ। কিন্তু ততদিনে অনেক লোক এসে বসে গেছে। মারধোর খেয়েও উঠল না। তারপর রফা হয়ে গেল সরকারের সঙ্গে। কাউকে উঠতে হবে না। কিছুদিন আগে পাকা দলিল এসে গেছে। ওরা বলে অর্পণ-পত্র।

প্রথমে সকলের সাহায্যে একটি টিনের চালা তুলেছিলেন ভবনাথ কিছুদিনের মধ্যে ঐ কলোনীর স্কুলে চাকরিও পেয়ে গেলেন, তার

সঙ্গে গোটা দুই টুইশানি। তারই উপর ভরসা করে কো-অপরারেটিভ থেকে কিছু ধার নিয়ে দুখানা ঘর তুলেছেন। পাকা দেওয়াল, পাকা মেঝে, উপরে টালি। ছেলে-মেয়েরাও পড়াশুনো করছে। কোনো রকমে চলে যায়। ইদানীং শরীরে ভাঙন ধরেছে। প্রায়ই অসুখে পড়েন। বয়সও হয়েছে। এমন সব চেয়ে বড় ভাবনা মেয়ের বিয়ে।

মেয়ে অবশ্য তা ভাবছে না। তার লক্ষ্য একটি চাকরি।

বি. এ পরীক্ষার এক বছর দেরি। এখন থেকেই খবরের কাগজ দেখে দরখাস্ত পাঠাতে শুরু করেছিল। জবাব বড় একটা আসত না। একদিন একখানা সরকারী খাম এসে হাজির। খুলে, খুশী হবার কথা কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। অথচ দরখাস্ত যেদিন করে তারপর থেকে আশায় আশায় দিন গুনছে। তার অঙ্কুর যখন দেখা দিল, ভিতর থেকে আর চাড় এল না।

শেষকালে পুলিশ হবে! পুলিশের দারোগা!

সবে তখন পুলিশ বিভাগ একটি নারী-বাহিনী গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরকার। তার মধ্যে থাকবে কয়েকজন সাব-ইনসপেক্টর এবং অ্যাসিট্যাণ্ট সাব-ইনসপেক্টর। দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে অন্ততঃ আই এ পাস, দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহী তরুণীদের কাছ থেকে। দীপালী যেমন সব জায়গার দেয়, তেমনি এখানেও একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়েছিল। ইণ্টারভিউ-এর ডাক এসে গেছে।

ইতিমধ্যে 'নারীপুলিশ' কথাটা হাসি-ঠাট্টা এবং কোথাও বিরূপ সমালোচনার খোরাক যোগাতে শুরু করেছিল। খবরের কাগজে কার্টুনও দেখা দিয়েছিল দু'চারটা। রক্ষণশীল মহলে প্রচুর ক্ষোভ। একটি ভদ্রঘরের মেয়ে পুলিশের পোশাক পরে চোর-ডাকাত ধরতে বেরোবে! দৃশ্যটাই অশোভন। তাছাড়া পুলিশ হলেও সে মেয়ে, যুবতী মেয়ে। তাকে রক্ষা করবে কে? রক্ষিকা যদি ভক্ষিকা হয়, তখন?

বাবা-মাকে না জানিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে এল দীপালী। সংসারের

দিকে চেয়েই মনস্থির করে ফেলল। বাবা আর বেশী দিন নেই। ছোট ভাই দু'টো স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। এদিকে চাকরির যা বাজার! এত দরখাস্ত তো পাঠাল। সাড়া বলতে এই একটি। একে অবহেলা করা যায় না।

ইণ্টারভিউ দিতে গিয়ে অনেকটা ভরসা গেল। তার মত আরো মেয়ে এসেছে। সকলেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। যেমন তেমন একটা চাকরি চাই। ভেঙে-পড়া কিংবা ভেঙে পড়তে উদ্যত সংসারকে তুলে ধরার মত যাহোক একটা খুঁটি। অশক্ত বাপ-মা, অক্ষম কিংবা অপোগণ্ড ভাইবোনদের অভাবের গ্রাস থেকে কোনো-রকমে বাঁচাবার জন্যে কোনো একটা অবলম্বন। তার চেহারা নিয়ে বাছবিচারের অবকাশ কোথায়? মাস গেলে কয়েকখানা নোট। তার অঙ্কটাই শুধু দেখতে হবে। এখানে যেটা পাওয়া যাবে নেহাত মন্দ নয়। মাইনে, ভাতা, বাড়ি-ভাড়া, সস্তা দরে রেশন, সব মিলিয়ে তাদের মত একটি ছোট্ট সংসারকে টেনে-টুনে চালিয়ে নেওয়া যাবে। তাহলে আর কী চাই?

ইণ্টারভিউ-এর ধরন দেখে দীপালীর মনে হল চাকরীটা হয়ে যাবে। নারী পুলিশের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সাব-ইনস্পেক্টর। পোশাকের একটা ধারণা পাওয়া গেল। খাকী ট্রাউজার, তার উপরে একই রং-এর বুশ-সার্ট, কোমরে বেল্ট, টেনে বাঁধা খোঁপার উপর টুপি, পায়ে কালো শু। কি কিম্ভূত না দেখাবে! ছবিটা মনে মনে কল্পনা করতে গিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। যে যুগে এসে জন্মেছে, মেয়ের মেয়েত্ব আর রইল না।

ইণ্টারভিউ যিনি নিচ্ছিলেন, বোধহয় কোনো উঁচুদরের পুলিশ অফিসার, কিন্তু কথাবার্তায় ভদ্র, ব্যবহারে মোলায়েম, হাসিমুখে প্রায় ঐ ধরনের কথাই বলেছিলেন—আপনারা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি করবেন, অথচ বলবেন, তোমাদের আর আমাদের ডোমেইন আলাদা, তোমরা রোদে পোড়, বৃষ্টিতে ভেজো, আমরা ঘরে বসে সাজি আর সাজাই—তা কেমন করে হবে? আপনি

হয়তো বলবেন, কেন, আমরা কি বাইরে বেরোচ্ছি না? চাকরি-বাকরি করছি না? করছেন। কিন্তু তার সীমানাটা বড় ছোট। ডাক্তারি, মাস্টারি, নার্সিং কিংবা বড়জোর কেরানী-গিরি। ওটা আরো বাড়াতে হবে।

আরেকজন বললেন, সেটা এমন কিছু নতুন নয়। আমরা যাদের 'নিম্ন শ্রেণী' বলি, হাটে-বাজারে, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় যারা গতর খাটিয়ে খায়, তাদের মেয়েরা তো বরাবরই পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সমান তালে কাজ করে আসছে। সেই একই জিনিস এবার দেখা দিচ্ছে আরেকটু উপর স্তরে। যুগের প্রয়োজনেই দিচ্ছে।

দীপালী মনে করল বাবা-মাকে আগে থাকতে একটু আভাস দিয়ে রাখা দরকার।

ভবনাথের বুকে সর্দি বসেছিল। সে-ই কলেজ থেকে ফিরে রোজ খানিকটা করে পুরনো ঘি মালিশ করে দেয়। সেদিন খানিকক্ষণ দেবার পর একটু সুস্থ বোধ করতে তিনি বললেন, এবার থাক মা। আর কত কষ্ট করবি আমার জন্যে?

—"কষ্ট কিসের? সামান্য একটু মালিশ।" কয়েক সেকেণ্ড থেমে বলল, এরপর একটা চাকরি-বাকরি পেয়ে গেলে, তখন তো তোমার কাছে একটু বসতেও পাব না।

ভবনাথ চুপ করে রইলেন মুখের উপর একটা ম্লান ছায়া পড়ল। তিনি জানতেন, দীপালী চাকরির চেষ্টা করছে। সেটা তাঁর একেবারেই ইচ্ছা নয়, কিন্তু সংসারের দিকে চেয়ে বাধা দিতেও পারেন নি।

দীপালীই আবার কথা পাড়ল—হয়তো শীগগিরই একটা পেয়ে যাব।

—কী চাকরি?—এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না ভবনাথ।

—অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছি। একটা নিশ্চই লেগে

যাবে! ·আজকাল তো সব রকম চাকরিই পাচ্ছে মেয়েরা। পুলিশ পর্যন্ত হচ্ছে।

—পুলিশ! হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম বটে। নারী-পুলিশ! ঝাঁটা মার দেশের কপালে! যেমন হয়েছে আমাদের গভর্নমেণ্ট, তেমনি হয়েছে মানুষগুলো।

—চাকরিগুলো কিন্তু মন্দ নয় বাবা। আমি খবর নিয়েছি।

ভবনাথ চমকে উঠলেন। চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মেয়েব দিকে। তাবপর চেঁচিয়ে ডাকলেন স্ত্রীকে, ওগো শুনছ—

দীপালীর মা ব্যস্ত হয়ে ঘবে ঢুকতেই বললেন, তোমার মেয়ে কি বলছে শোনো—

মা জিজ্ঞাসু চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। সে চুপ করে রইল। ভবনাথই বললেন, তোমার মেয়ে পুলিশ হবে। নাবী-পুলিশ!

মা কিন্তু চমকেও উঠলেন না, ভয়ও পেলেন না। বেশ সহজভাবে বললেন, তা, কি করবে? পুলিশ-ফুলিস যাহাকে একটা কিছু হতে তো হবেই।

ভবনাথের মুখে আর কোনো কথা সরল না স্ত্রীকে তিনি এতটুকু থেকে চেনেন। কথাগুলো যে তার অন্তরের কথা নয়, তাঁর চেয়ে কে বেশী জানে?

চিঠি সত্যিই এসে গেল। বাড়ির সকলেই জানল। কেউ কিছু বলল না। ভাই দুটো দিদিকে এড়িয়ে চলল। মা তাদের গোপনে সাবধান করে দিলেন, আশপাশের লোকগুলো যেন না জানতে পারে।

চাকরিতে যোগ দিতে যেদিন বেরোবে, মাকে প্রণাম করল দীপালী। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বাবার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, ভাইয়েরা বেশ কিছুটা আগেই স্কুলে বেরিয়ে গেছে।

পুলিশ হলেও অফিসের কাজ। লালবাজারে দশটা পাঁচটা ডিউটি। কিন্তু আসতে হয় ইউনিফর্ম পরে। ফলে যেখানে সেখানে 'ট্রাফিক জ্যাম্'। শুধু ভিড় নয়, তার ভিতর থেকে নানা সুরের রসিকতা, বিদ্রূপ।

দীপালী বেরোতে তার সাধারণ পোশাকে। বৌবাজারে এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানে থাকত সরকারী খাকী সাজ। সেজে নিয়ে কাজে যেত, আবার ফিরে এসে ওগুলো ছেড়ে রেখে ট্রেন ধরতে ছুটত।

এরই মধ্যে আরো কয়েক লাখ উদ্বাস্তু এসে ছেয়ে ফেলেছে কলকাতা আর তার আশপাশ। খালি জায়গা পেলেই রাতারাতি জবর-দখল। জমির মালিকের কানে যখন খবরটা পৌঁছল, তার আগেই সমস্ত জায়গা জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে সারি সারি টিন-টালি-চাটাই-হোগলার চালা। ভিতরে ঘরকন্নার কলরব। বাইরে নানা রকম ব্যস্ততা—মাপ জোখ, রাস্তাঘাট তৈরির আয়োজন, কমিটি বৈঠক। উড়ে এসে জুড়ে বসার কোন লক্ষণ নেই।

মালিক যদি কোর্টে যান, যথারীতি এবং যথাকালে ইজেক্‌টে্‌মেণ্ট অর্থাৎ উচ্ছেদের অর্ডার বেরোবে। কিন্তু উচ্ছেদ করবে কে? কোন কোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে-সব মালিক সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তাদের বেলায় হয়তো পুলিশী সাহায্য মঞ্জুর হবে। কিন্তু পুলিশ এলেই পুরুষেরা প্রায়ই গা-ঢাকা দেয়, এগিয়ে আসে মেয়েরা। কোথাও কোথাও রীতিমত নারী-বাহিনী, এবং ব্যাক্যবাণই তাদের একমাত্র অস্ত্র নয়, তার সঙ্গে অবাধে চলতে থাকবে দা, বঁটি নোড়া, কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি কিংবা ইট-পাটকেল। অর্থাৎ পুরুষ পুলিশের হটে আসা ছাড়া অন্য পথ নেই।

কিন্তু সরকার তো আর হটে আসতে পরেন না। আইনকে বলবৎ করা তার প্রাথমিক দায়িত্ব। ল' মাস্ট বি এনফোর্সড্। অতএব ডাক পড়ল নারী-পুলিশের।

টালিগঞ্জের দিকে কার একটা পোড়ো বাগান দখল করে বসেছিল

াস্তুরা। তাদের তুলতে হবে। সংখ্যায় খুব বেশি নয়, কিন্তু
জ প্রচুর। একটি মাঝারি গোছের পুলিশ ফোর্স পাঠাতে
ছে। বন্দুকও আছে কিছু, অফিসারদের কোমরে রিভলবার।
টি মেয়ে অফিসার রয়েছে ঐ সঙ্গে। তারাও সশস্ত্র। উদ্দেশ্য
শ্য মারধোর নয়; যে সব মেয়েরা তেড়ে আসবে তাদের ভিতর
ক কিছু গ্রেপ্তার।

পুলিশের সাড়া পেয়ে সাবা কলোনীতে চেঁচামেচি, ছুটোছুটি
া গেল। একদল মেয়েই বেশি সোচ্চার। ঠিক সামনে
দরই জাতের পুলিশ দেখে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে গেল।
পর শুরু হল গালাগালি, টিটকারী। 'লজ্জা করে না।' 'পুলিশ
জ রাস্তায় বেরিয়েছিস।' 'ঘরে কি তোদের মা বোন নেই?'…
াদি, এবং তার সঙ্গে আরো অনেক কিছু, যা শ্রাব্য নয়।

ওসব গায়ে মাখতে গেলে চলে না। মেয়ে অফিসারেরা চালা
ার ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'দীপু!'

দীপালী চমকে উঠে তাকাল। অন্ধকারের মধ্যে বিশেষ কাউকে
করতে পারল না। কিন্তু এ স্বর তো কোনোদিন ভুলবার নয়।

ঠক সামনে তক্তপোষের উপর যে মহিলাটি বসে ছিলেন তাঁকেও
া চিনতে পারল না। পরনে ছেঁড়া থান, মাথায় একরাশ
পাকা চুল, কোটরে ঢোকা চোখ, তার ভিতরে কেমন একটা
ন্ত দৃষ্টি। সারা দেহ কঙ্কালসার। কেমন একটা ভাঙাভাঙা
শানা গেল—কেন যাব, কোথায় যাব? ওখান থেকে মেরে
র্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিল, এখান থেকেও তাড়িয়ে দেবে?
যাব না।

বার চিনল দীপালী। সারা অঞ্চলে ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন
ীর বড়গিন্নী।

ম্যারেস্ট হার!' আবার চমকে উঠল দীপালী। কোথায়

যেন চলে গিয়েছিল। উপরওয়ালার হুকুম এক মুহূর্তে তাকে বাস্তবের মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। সারা দেহে যেন একটা f স্রোত বয়ে গেল। নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ইচ্ছা হল এই খা খোলসটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এখান থেকে পরক্ষণেই মনে পড়ল, বাবা আর উঠতে পারছেন না, এ-জীবনে অ পারবেন না।

পিছন থেকে আবার গর্জে উঠল সেই স্বর—হোয়াট আর ইউ ডুইং! টেক্ হার টু দি ভ্যান্।

হাতদুটো বাড়িয়ে সেই অস্থিচর্মসার বৃদ্ধাকে জাপটে ধর দীপালী এবং টানতে টানতে নিয়ে চলল অদূরে অপেক্ষামান পুলিশ ভ্যানের দিকে।